মণিমুক্তো

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

প্রভা প্রকাশন
৪ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬২

প্রচ্ছদ : দেবাশীষ কুণ্ডু

প্রভা প্রকাশন ঃ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯-এর ক্ষেত্রে শ্রীরণেন গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে শ্রীঅলোকনাথ ভদ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

'সুখবর' মাসিক পত্রিকার পরিচালক
এবং প্রকাশক সাহিত্যপ্রেমিক
শ্রীদুর্গাচরণ পাঠক

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের :

নিশিগন্ধা	(গল্প)
মাটির পৃথিবী	(উপন্যাস)
অন্নকূট	(গল্প)
কলরোল	(কবিতা)
উপনদী	(উপন্যাস')
মেঘ পাহাড়ের গান	,,
সাগর আকাশ	(কবিতা)
দ্বিতীয় বাসর	(গল্প)
একজন আর কয়েকজন	(স্মৃতিকথা)
হৃদয়ে গোলাপ	(কবিতা)
পথের ধূলোর রঙে রঙে	(স্মৃতিকথা)

১

।। মণিমোহনের কথা ।।

আমার নাম মণি।

মণিমোহন মুখোপাধ্যায়। পিতৃপুরুষের পরিচয় বিশেষ কিছু জানিনে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা আর আগেকার দিনের মতন বংশ পরিচয়ের সুমহান ঐতিহ্যের বড়াই করে না। তাই আমি বলিনে আমার বাপ চোদ্দ পুরুষ এককালে নৈকষ্য কুলীন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিংবা কোন আদিকালে গ্রামবাংলার এক সম্ভ্রান্ত বর্ধিষ্ণু পরিবার, বংশ পরম্পরায় জমি জায়গা বিষয়-সম্পত্তির আয়ে হুগলী জেলার এক জমিদার ভবনে বারোমাসে তের পার্বণে কী জমকালো জীবনই না যাপন করে গেছেন।

আমার বাবা এখনো মাঝে সাজে সেই গালগল্প ছড়ান বটে, আমি তাতে কান দিইনে। আমি সে গৌরবকে অগৌরবই মনে করি। তার চেয়ে যদি তাঁরা ব্যবসা পত্তর করতেন—বুদ্ধিতে উজ্জ্বল হতেন, আধুনিককালের পাশ্চাত্য শিক্ষা শিখে জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ইংরেজ আমলের হাকিম উকিল হয়ে রায়বাহাদুর, রায়সাহেব উপাধি লাভ করতেন,—কিংবা রাজ সরকারি দপ্তরে বা ইংরেজ বণিকের সওদাগরী অপিসে বংশ পরম্পরায় বড়বাবুর কাজও করতেন তা হলে হয়ত তারই উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও আজ যা হোক একটা কিছু করতে পারতাম। সাতাশ আটাশ বছরের যুবক হয়ে আজ অন্তত ছাপোষা কেরানিজীবনও যাপন করতে পারতাম। যাহোক ভদ্রলোকের জীবন হত আমার। স্ত্রীকে দেখে পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের দল বলতে পারত বটে—হ্যাঁ, অপরূপা না হলেও মণির বউ সুশ্রী ভালো ঘরের মেয়ে। আর মণিও বাপের অপিসে দিন দিন বেশ উন্নতির ধাপে উঠে চলেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। আমি মণিমোহন মুখোপাধ্যায় ওরফে

মণি মুখার্জী মোটেই মানুষের মতন মানুষ বা বনিয়াদী বংশজাত আসল মণিরত্ন হয়ে উঠতে পারলাম না।

হীরে, পান্না, জহরৎ, মণিমুক্তার জৌলুষ আমাদের পরিবারে কবে ছিল জানিনে, কিংবা আমার ধারণা কস্মিন কালেও ছিল না। আর এখন যে নেই তার জন্যে বিশেষ অনুশোচনা আমার নেই,—অনুশোচনা শুধু নামের ক্ষেত্রে এ অলঙ্কারের অলঙ্করণের বৃথা অহঙ্কার প্রকাশ করা কেন? এর চেয়ে সাধারণ সব নাম রাখালচন্দ্র, গঙ্গাচরণ, সতীকান্ত এই ধরনের কিছু রাখলেই হত!

তা নয় মণি। মণি মানে রত্ন বিশেষ।

দুই ভাই বোন আমরা। বাপ-মায়ের দুই সন্তান। বাবা চুনিলাল তিনিও রত্ন, লাল রংয়ের মণি। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নামের অধিকারী। মায়ের তরফে বরঞ্চ এ রকমের বৃথা অহঙ্কার নেই। দু' অক্ষরের সাদা সিধে নাম অশ্রু। হয়ত পূর্বে অশ্রুমতী ছিলেন; আর বাবার পাল্লায় পড়ে অশ্রুমুখী হয়েই রইলেন সারা জীবন।

বাবা কাজ করতেন এক বিলিতি ফার্মে। অতি অল্প টাকা বেতন। তখনকার দিনে এক ব্রিটিশ ফার্মের স্টোরকীপারের চাকরি। তবু যদি সৎ পথে থেকে গরিবের মতন ঘর সংসার করতেন, তা হলে হঠাৎ চাকরিটি খোওয়াতেন না। আর আজকের দিনের ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলনের দৌলতে মাস মাইনে বেশ ভালোই হত। আমার বাবা চুনিলাল লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। আর তা পারেননি বলেই আজ সংসারের এই হাল!

কিন্তু রাম না হতে রামায়ণের পালা কেন? আমি যা শুধু তাই বলি।

বাবার চাকরি গেল। আমি তখন সবে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাস করেছি। কলেজে ভর্তি হব। ছোট বোন পান্না স্কুলে পড়ে বাড়ির কাছাকাছি এক বালিকা বিদ্যালয়ে। হুগলী জেলার কোন প্রাক্তন জমিদারের ভাঙা পৈত্রিক বাড়িও নয়, থাকি শিয়ালদার

কাছে সুরি লেনের সেকেলে এক বিবর্ণ দোতলার বাড়ির একতলার ছু'খানি লোনা ধরা অন্ধকার ঘরে অনেককালের কম ভাড়ার সাবেকী ভাড়াটে হয়ে।

স্টোরের মাল সর্ট—হাতেনাতে চুরি ধরা পড়েনি। বাবাকে তাই চৌর্য-অপরাধে অভিযুক্ত করা যায়নি, কিন্তু সন্দেহ আর দায়িত্বহীনতার জন্যে এতদিনের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

বাবা-মা আর আমরা ছু' ভাই বোন—ছোট সংসার। কম টাকা ভাড়ার ভাড়াটে বাড়ি হলেও আজকের দিনের জীবনধারণের ব্যয় ভার বড় কম নয়। বাবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মা অশ্রুময়ীর চোখে জল ভরে উঠল, হে ভগবান এখন উপায়!

নিরুপায়ের উপায় বুঝি ভগবান। উপায় জুটে গেল। বাবার চাকরি হল না। হল আঠার উনিশ বছরের ছেলে আমার।

অফিসসূত্রেই সিন্ধি সম্প্রদায়ভুক্ত চৈতমল লালভানির সঙ্গে বাবার খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল। চৈতমল লালভানির বোম্বে পার্শি পাড়ায় কাপড়ের আড়ৎ—লেডিজ ক্লথ এবং গারমেণ্টস্-এর দোকান। শুধু কলকাতা শহর নয় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বড় বড় শহরেই এই কারবারের শাড়ি ব্লাউজ এর বিক্রয় কেন্দ্র আছে। বড়বাজারে একদিন চৈতমলের সঙ্গে বাবার দেখা-সাক্ষাৎ।

চৈতমল পুরোন দিনের বন্ধু। বাবা ধরে নিয়ে এলেন তাঁকে বিকেলের দিকে আমাদের সুরি লেনের বাসা-বাড়িতে।

'আরে ইয়ার, এ কেয়া হালত্ হ্যায়! এ্যাতনা রোজ নকরি তো কিয়া, লেকিন'—চৈতমলের কথায় বাবা ছুঃখ করে নিজের কথা সবিস্তারে জানালেন।

পান্না চোদ্দ বছরের মেয়ে—পান্নাই নিয়ে এল এরই মধ্যে গরম লুচি, হালুয়া আর সন্দেশ। সাজানো রেকাবে আহার্য দেখে চৈতমল অত্যন্ত আপত্তি প্রকাশ করলেন, 'এ কেয়া!'

'কুছ্ নেহি, কুছ্ নেহি।'

বাবার কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে উঠলাম,

'আপ পিতাজিকা পুরানা দোস্ত !'

চৈতমল আমার দিকে ফিরে তাকালেন। কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বাবাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ঠিক হায় চুনিবাবু! লেড়কাকো হামারা পাস ভেজ দেও, বোম্বে মে। হাম্ উন্‌কো নক্‌রি দেগা।'

বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, 'তুমিই ভাই চৈতমল ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।'

'আচ্ছি বাত্ !'

তারপর দিনই বোম্বে মেলের রিজার্ভড ট্রেনের উচ্চশ্রেণীর কামরায় চড়ে বোম্বে গিয়েছিলাম। চাকরি পেলাম দোকানে শাড়ি বেচার। মাইনের টাকা চৈতমল নিজেই বাবাকে পাঠিয়ে দেন মনি-অর্ডারে। আমি তাঁর হেফাজতে থাকি। খাওয়া-পরা, থাকার ব্যবস্থা—সবই চৈতমলের।

কলেজে পড়া আর হল না। মা-বাবার একমাত্র ছেলে হীরে জহরৎ না হয়ে হলাম শাড়ির দোকানের সেলস্‌ম্যান।

বছরে মাত্র একবার দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে বাপ-মার কাছে কলকাতায় সুরি লেনের বাড়িতে আসি। সামান্য কত যে মাইনে পাই তা জানিনে। কেননা, সে কথা চৈতমল আমাকে জানান না। তবে ভদ্রলোকের বিবেচনা আছে, হাত খরচা বলে দশ-বিশ টাকা প্রতি মাসেই আমার হাতে তুলে দেন।

ছোট বোন পান্নাও বছর দুয়েক বাদে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছে। তবে কলেজ পড়ানোর সামর্থ বাবার কিংবা আমার নেই। তাই সে ঘর-সংসারের কাজ করে। বিয়ের চেষ্টাও তার চলছে।

আমাকে এরই মধ্যে মানুষ করে দিয়েছেন চৈতমল। কাপড়ের গদির কাউন্টারে বসে এখন আর শুধু খরিদ্দারকে শাড়ি ব্লাউজ ব্রা দেখানো আর বিক্রি করা নয়—এ ব্যবসার যা কিছু তাই বুঝিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছেন চৈতমল লালভানি। বোম্বের বাজারে শুধু নয়, তামাম কাপড়ের দুনিয়ার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী তিনি।

কেমন করে শাড়ির রঙ পছন্দ করাতে হয় শৌখিন আধুনিক মেয়ে ক্রেতাদের আর কোথা থেকে শস্তায় শাড়ি সওদা করতে হয়, সাচ্চা এবং ঝুটা জরির তফাৎ কোনখানে, কোন জাহাজে শাড়ির লট বিক্রি হয়, শাড়ির জমির তারতম্য, সুতোর ফাঁক ভরাট করা—কিছুদিনের মধ্যে এ সবই আমার নখ-দর্পণে এসে গেল।

তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ঘোরানো-ফেরানো। দোকানে বসে শাড়ি বিক্রি আর নয়। আমি হলাম সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ। ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন কামরায় ট্র্যাভেলিং, ভালো হোটেলে খাওয়া-থাকা, মাস-মাইনেও বর্ধিত হারে। আমি মানুষের পর্যায়ে ধাপে ধাপে উঠছি। কিন্তু লাগাম ছাড়া হতে দেন না চৈতমল। রাশ ঠিক টেনে রেখেছেন।

আমার পিতৃবন্ধু চৈতমল লালভানি বাস্তবিকই পিতৃস্বরূপ হয়ে আমাকে শাড়ি কাপড়ের ব্যবসায়ের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কয়েক বছর তাঁর আশ্রয়ে থেকে বাড়ির আদর-যত্নই পেয়ে এসেছি। সতের-আঠারো বছরের ছেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজের মুখ দেখতে না-পাওয়ার বেদনাকে অনুভব করতে পারিনি, কিংবা কলেজের দরজা পার হয়ে বেকার-জীবনে হা-চাকরি যো চাকরি করে শহরের রাজপথে ফ্যা ফ্যা করেও ঘুরে বেড়াতে হয়নি।

সংসারে বাবা-মাও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন কিছুটা। আমার মাস মাইনের দরুণ চৈতমল যা পাঠাতেন তাতে তাঁদের একেবারে শোচনীয় দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়নি। বরঞ্চ অল্প-স্বল্প দু'একখানা সোনার গয়নাও পান্নাকে গড়িয়ে দিয়েছেন—আইবুড়ো মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগবে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল! কী এক ভীষণ দুর্দিনের মাঝখানে আবার পড়ে গেলাম। একদিনের বুকের প্রচণ্ড ব্যথার রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার অসহ বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে চৈতমল চোখ বুঁজলেন। সে চোখ আর খুললেন না। আর পার্সি বাগানেই তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হল।

চৈতমলের তিন ছেলে এক মেয়ে।

ছেলেমেয়েরা বাপের ধারা পায়নি। কন্‌ভেন্টের শিক্ষায় অতি-মাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। আমি তাদের নোকর।

চৈতমলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমি যে সামান্য একজন নোকর সে-ভাবটি প্রকটিত হয়ে উঠল। বাপের ব্যবসা তিন টুকরো হল। মেয়েরও অংশ আছে। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন চৈতমল ঘটা করেই, কিন্তু পাকা ব্যবসাদার হয়েও আসল হীরে চিনতে ভুল করেছিলেন তিনি। জামাই বিলেত-ফেরৎ বটে—বিজ্‌নেস ম্যানেজমেণ্টে পড়তে গিয়ে ঠেক খেয়ে বোম্বাইতে আবার ফিরে এসে বাপের ঘড়ির কারবার দেখে। বিলেতে কিছু কিছু কুকাজও করেছে আর সে খবর চাপা নেই।

চৈতমলের স্ত্রীও আপস্টার্ট সিন্ধিমহিলা। চৈতমলই কেবল ছিলেন এ পরিবারের মধ্যে ব্যতিক্রম ব্যক্তি। আমাকে তিনি বন্ধু-পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর সে মর্যাদা রইল না। রইল না বলেই আমি হলাম শুধুই নোকর।

পার্সি বাগানের সেই রমরমা শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রার বিজ্‌নেস ভেঙে ভেঙে চার টুকরো হয়ে গেল। তিরিশ বছর থেকে বিশ বছরের বয়সী ছেলে মেয়েরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে আলাদা আলাদা দোকান করল।

এখন কার নোকর হব আমি?

মানে মানেই পার্সি বাগানের আস্তানা ছেড়ে দাদারের কাছে আর এক দোকানে এসে আশ্রয় নিলাম। শাড়ি গার্মেণ্টস্-এর অভিজ্ঞ কাজ জানা লোক—চাকরির অভাব হল না। সেই সেলস্‌ম্যানগিরির চাকরিতেই আবার বহাল হলাম। সিন্ধি সম্প্রদায়ের আর এক ক্লথ মার্চেণ্ট। বোম্বে দাদার বাজারে বড় দোকান। আমার কাজ দোকানে বসে নয়। আগের মতনই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শাড়ি বিক্রির কাজ করি।

এই হল আমার জীবনের পূর্বাভাস।

২

।। মুক্তোর কথা ।।

আমি হচ্ছি মুক্তা ঝিনুকের গর্ভজাত রত্নবিশেষ।

কিন্তু আসল মুক্তা নই। কেননা—আমাদের সিন্ধি পরিবারে অনেক হীরে, চুনি, মুক্তার লেনদেনে আসল এবং নকল জহরতের পরিচয় আমার অজ্ঞাত নয়। মুক্তার বদলে সবাই আমাকে মুক্তো বলেই ডাকে। আসল আর নকলের এই প্রভেদ ডাক নামেই বুঝি ব্যক্ত হয়। কিন্তু এতবড় জহুরি-পরিবারজাত হয়েও আমার মায়ের মিথ্যে আভিজাত্যের অহঙ্কারের অন্ধ চোখে সাচ্চা রত্নও ঝুটা হয়ে গেছে। তা না হলে বাবার মৃত্যুর পর মা যদি তিন ছেলে আর জামাই-এর ধোঁকা-বাজীতে না ভুলে আসল রত্ন মণিকে চিনতেন তা হলে বোম্বাই পার্সি বাগানের অমন শাড়ি ব্লাউজের কারবার এমন নষ্ট হয়ে যেত না।

চৈতমল লালভানির সেই জাঁকজমকের শাড়ির দোকান ভেঙে তিন ভাইয়ের তিন টুকরো হল, তারপর আমার শেয়ারের এক টুকরো জামাই পেল। শেষ পর্যন্ত হল কী?

তিন বছরেই সব শেষ। চৈতমল লালভানির ফার্ম বলতে আর কিছু নেই বোমবাই শহরে। তিন ভাই জামাই হয়ে গোয়ার অধিবাসী। তিন ভাই এক বাড়ির গোয়ানিজ ধনী পরিবারের তিন বোনকে বিয়ে করেছে।

বোমবাই-এর পার্সি বাগানের সেই বাড়িখানিও বিক্রি হয়ে গেছে মায়ের মৃত্যুর পর। বাবা মারা যাওয়ার দু'বছর পরে মা মারা যান।

আর আমি লালিমা লালভানি কুমারী-জীবনের পর মিসেস মতিরাম হয়ে লম্পট স্বামীর সংসারে বেশিদিন ঘর করতে পারলাম না। এমনকি বাবার কারবারের অংশ কন্যার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েও রাখতে পারলাম না।

স্বামীকে পাইনি। স্বামীর এক বন্ধুকে পেলাম। কন্‌ভেন্টে লেখা-পড়া শিখেছি, সংস্কারের বালাই নেই। স্বামীর পাইলট বন্ধুর সঙ্গে একরাত্রে উধাও হলাম। নারীর বঞ্চিত জীবন হাহাকারে ভরিয়ে রাখব কেন?

স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেই বা ক'দিনের জীবন?

সে ঘরও ভাঙল। জুহু সমুদ্রের ধারে বালির ঘর বানাতে দেখেছি অনেককে। আমিও কিশোরীজীবনে এমন কত বালির ঘর তৈরী করতাম। সমুদ্রের জলে তা ধুয়ে মুছে যেত।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে।

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন।

চোদ্দ বছরের মেয়ে আমি তখন। বাবা কলকাতা থেকে তাঁর এক বন্ধুর ছেলেকে নিয়ে এলেন আমাদের বোম্বাই শহরের পার্সি-বাগানের বাড়িতে। আঠার উনিশ বছরের যুবা। ভারি সুন্দর দেখতে। বাঙালিবাবু। নাম শুনলাম মণি।

মণি তো জহরৎ।

জহরৎ না ছাই, আমাদের দোকানের এক নোকর। বাড়িরও ফাই-ফরমাশ খাটে। নোকর। নোকরের চেহারা অনেক জায়গায় তো সুন্দর দেখা যায়। তবু নোকর নোকরই। তাই নোকরের দিকে মনিবের মেয়ের তাকাতে নেই। তাতে আভিজাত্যের হানি হয়। মা বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আর কন্‌ভেন্টে পড়া মেয়ে আমি। নোকরের রূপে মুগ্ধ হওয়ার মতন দুর্বল মন আমার নয়।

আমার জন্মদিনে দোকান বন্ধ সেদিন।

কী জাঁকজমকের অনুষ্ঠান সেদিন আমাকে কেন্দ্র করে। আমার প্রথম পক্ষের স্বামীও সেদিন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন রাত্রে জন্মদিনের ভোজ সভায়। কেননা, আমার মায়ের পছন্দ করা ভাবী

জামাই সে। সুন্দর চেহারা যদিও তবুও সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় মণির মত সুন্দর নয়।

বিকেলের দিকে বাবার সঙ্গে জুহুর সমুদ্র-তটে গিয়েছিলাম —বাবার মোটরে চড়ে। সঙ্গে ছিল আমাদের দোকানের বাঙালি নোকর মণিমোহন। জোয়ান মরোদ—কিন্তু হ্যাঁ, জহুরি বাবা আসল রত্নই চিনেছিলেন—মোনি, হ্যাঁ, সচ্চা রতন!

সমুদ্রের বালি নিয়ে বালুকাতটে ঘর বানাচ্ছিলাম—সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ল। বালির ঘর ধুয়ে-মুছে গেল।

চোদ্দ বছরের মেয়ের চোখে ধুয়ে-মুছে যাওয়া বালির ঘরের জন্য কী আর্তিভরা জল! সে জল মুছিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা অবিশ্যি মণির হয়নি, আর সে ঔদ্ধত্যও সে প্রকাশ করেনি; কিন্তু সহানুভূতিমাখা স্বরে মণি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, 'বালির ঘর ধুয়ে গেছে তাতে কী? আসল ঘর কত মজবুত হবে দেখো তোমার।'

'চোপ রহ স্টুপিড!'

বোকা মণিমোহন বোকা হাসি হেসে চুপ করে গিয়েছিল। মণিকে আর কোনদিনই পাত্তা দিইনি। কিন্তু তবুও তার অসাক্ষাতে তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখতাম। বাবার মুখে তার করিৎকর্মের কথা শুনে খুশিই হতাম।

'ছোকরা বহুত হুঁশিয়ার!'

বাবা বারবার বলতেন—ও ছেলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। কাজ কর্মে খুব মন, আর ভারী চালাক-চতুর কর্মঠ ছেলে।

সে চালাক চতুর কর্মঠ নোকরকে ছেড়েই আমার বাপের বাড়ির সংসার অমন বালির ঘরের মতই ভেঙে-চুরে গেল। সমুদ্রের ঢেউ-এর আছাড়ে আমার জীবন-ঘরও ধুয়ে-মুছে গেছে।

পর পর দুটি ঘর ভাঙল। তারপর আবার অন্য জীবন। মায়ের নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গেই প্রথম বিয়ে। তখন কনভেন্ট ছেড়ে কলেজে পড়ছি। বি-এ পাস করলাম। প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

পরে নিজের পছন্দে আবার বিয়ে করলাম। কিন্তু তাও কপালে সইল না।

ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি অনুরাগ আমার। উত্তর এবং দক্ষিণ প্রদেশের ওস্তাদ এবং নৃত্য শিক্ষক রেখে বাবা ভালো নাচ-গান শিখিয়েছিলেন আদরের মেয়েকে। বাপের চোখের মণি ছিলাম আমি।

নিরুপায় হয়ে এখন আমি নাচ-গানকেই জীবনের আশ্রয়স্থল বলে গ্রহণ করেছি। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? বারবার বিয়ে করে ঠকার চেয়ে নাচ-গানের ব্যবসা বৃত্তি ভালো। দোস্তিও যদি করতে হয় তাহলে সেই সব ধনী সম্ভ্রান্ত-খদ্দেরের সঙ্গেই করা ভালো যারা একরাত্তির বা দু-রাত্তিরের প্রেম-প্রণয়ের সঙ্গী। ঘর বাঁধা আর নয়।

এখন আমি বিখ্যাত নর্তকী এবং গায়িকা মুক্তোবাঈ। বাইজীও বলা যায়। বড় মহলে বাইজী বলেই পরিচয় আমার। লক্ষ্ণৌ-এর নামকরা বাইজী। ঠুংরি, কাজরি গানের সঙ্গে নাচি। গানও গাই। আসর বসাই। আবার জলসা-পার্টিতে এনগেজমেণ্ট নিই।

হ্যাঁ, রোজগার করছি। লক্ষ্ণৌতে ফয়জাবাদ রোডে সুন্দর বাড়িও কিনেছি। দাস-দাসী—পয়সার অভাব নেই এখন আমার। আমার সিদ্ধি বংশের পরিচয়ে এখন কেই বা চেনে জানে আমাকে? বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ির আর ধার ধারিনে। জীবন সমুদ্রের ঢেউ—ওঠে, আছড়ায় আবার মিলিয়ে যায়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

যা গেছে তা গেছে। তার জন্যে হা-হুতাশ করে কারা? যারা শুধু সংস্কার নিয়ে বাঁচে। যারা অক্ষম, যারা নিরুপায়। আমি তো তা নইই। এখন আর আগেকার সমাজ নেই যে সমাজে পতিত হবার ভয়। সংসারে থেকে যারা পতিতা,—বাইরের পতিতা থেকে তাদের জীবনের গৌরব বা অহঙ্কার কোথায়?

তা বলে কী আমি বার বণিতার মতন যার তার কাছে দেহ বেচে খাই? না, তা নয়। শিল্পী-জীবনের আভিজাত্যবোধ আমার আছে।

এখন আমি একলা থাকি।

লক্ষ্ণৌ-এর নব নির্মিত অভিজাত পল্লীতে সুন্দর সুশ্রী বাড়ি কিনেছি। শুধু জলসা আর বাবুদের আমোদ প্রমোদ উত্থানে নাচ গান করে অর্থোপার্জন নয়। তাতে আর কত টাকা হয়? আজকাল তো আর নবাব বা রাজা উজীরের দেশ নেই। ইংরেজ রাজত্বেও ছিল। স্বদেশী জামানায় অবিশ্যি কালো বাজারের ফাঁপা টাকায় ধনী বড়লোকের অভাব নেই।

বণিকসভ্যতার যুগে অর্থের স্রোত বয়ে চলেছে। আর আমোদ ফুর্তি পার্টি কক্‌টেল বা কম কোথায়। কিন্তু দেহ ছাড়া সেখানে শিল্পের কদর নেই। দেহ বিলাসিনী হয়ে অবিশ্যি এসব জায়গা থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু সে পথ কদর্যতার পথ। কনভেণ্টে পড়া মেয়ের সে পথে রোজগার পছন্দসই নয়।

আমি মুক্তো রোজগারের আর এক পথ জানি। সে পথে এখন জনপ্রিয়তার সঙ্গে অর্থোপার্জনও প্রচুর হয়।

সে ক্ষেত্রে আবার লক্ষ্ণৌ থেকে বাপের বাড়ির দেশেই আমাকে ছুটতে হয়। সেই বোম্বাইতে। সিন্ধু দেশের কোন জায়গায় আমাদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি ছিল তা অবিশ্যি আমার জানা নেই। আমি জানি যখন কুমারী জীবনে লালিমা লালভানি ছিলাম তখন পিতৃভূমি আমার বোম্বাইতে। বোম্বাই আমার আসল দেশ।

সেই দেশেই মাঝে মাঝে ছুটতে হয় টাকা রোজগার করতে। বোম্বাই ফিল্মে নাচ গানের অভিনয়ে বেশ মোটা টাকার কনট্রাক্ট। এ পেশায় আমার পরিচয় এখন জনসমাজে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি এখন পপুলার ফিল্ম এবং ডান্সের স্টার।

বাড়ি, গাড়ি, আমোদ, ফুর্তি, যশ, প্রণয়ী, দাস দাসী, অর্থ, বিত্ত কিছুরই অভাব নেই আমার—তবু জুহু বীচের বালুকাময় ঘর তৈরীর কথা মনে পড়লে মন মাঝে মাঝে হাহাকার করে ওঠে কেন? চোখের কোণ ছাপিয়ে জলই বা আসে কেন?

আর সেই বাঙালি নোকর,—আমাদের বাড়ির সেই রত্ন বিশের

মণিমোহনের কথাই বা মনে পড়ে কেন? চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ের বালির গড়া ঘর ভেঙে গেলে যে আশ্বাস দিয়েছিল একদিন—কাঁদছ কেন মিসিবহিন, তোমার কত সুন্দর বর আর মজবুত ঘর হবে একদিন। এ তো বালির ঘর। ইয়ে ঝুটা হায়।

সে ঘর ঝুটা। বালির ঘর সমুদ্রের ঢেউ এসে ধুয়ে মুছে দেয়।

আসল ঘরও তো ভেঙ্গে গেল ঝড়ের দাপটে। কই, মণিমোহনের কথা তো সত্যি হল না। একবার দেখা পেলে তার কাছ থেকে বেশ কড়া গলায় জবাব পেতে চাই,—কিশোরী মেয়ে পেয়ে এমন নির্মম পরিহাসের কথা কেন সে শুনিয়েছিল?

মনির খবর যে একেবারেই জানিনে তা নয়।

জানি, বাবার মৃত্যুর পর বোম্বাই-এর শেঠ নাথুমলের শাড়ির আড়তে শাড়ি বিক্রির কাজ নিয়েছে। শাড়ি, ব্লাউজ পীস আর সায়া, ব্রা নিয়ে সে ভারতবর্ষের এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়ায়।

আর কোন গোপন কাজও সে কী করে? সন্দেহ হয় আমার। দাদারের শেঠ নাথুমল পানওয়ানির আসল পরিচয় আমার জানা আছে। শাড়ি কাপড়ের ব্যবসা তার ছুতো মাত্র। গোপনে কালো-বাজারের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে চোরাচালানির মেকি জুয়েলারির কারবার তার আসল ব্যবসা। আর সে ব্যবসায় পানওয়ানি শেঠ মস্ত ধনী। মণিমোহন কী শুধুই শাড়ি বেচে?

যা খুসি করুক না কেন সে তাতে আমার কীই বা আসে যায়? আহা, তবুও কেমন যেন মমতা জাগে। তার মনিব আমার বাবার মৃত্যুর পর সে বেচারী মুখ তুলে কোন দিনই বাবার বিশ্বস্ত কর্মচারি হয়েও আমাদের দুর্ব্যবহারের কোন প্রতিবাদই করেনি।

এমন কী বাবা বেঁচে থাকতেও কোনদিন সে নিজেকে আমার সামনে মেলে ধরেনি কখনো। মায়ের কড়া দৃষ্টি ছিল তবুও সময় সুযোগ খুঁজলে কী একেবারেই বিফল হত। আমি যে একেবারে তাকে পাত্তা দিতাম না এমন কথা জোর গলায় বলি বা কেমন করে?

সত্যিই—মণিমোহন আমার মণি, আমায় কাছে একেবারে উপহাসের পাত্র ছিল না। তার সুন্দর সুশ্রী সবল যৌবনদীপ্ত চেহারা দেখতে আমার ভালোই লাগত। তার কণ্ঠস্বরে কেমন মাদকতার স্পর্শ ছিল। লুকিয়ে চুরিয়ে আমি তাকে দেখতাম, তার কথা শুনতাম। তার গলায় স্বর শুনে আমার মনে হয়েছিল রেওয়াজ করলে আর উপযুক্ত ভাবে গান শিখলে সে সঙ্গীত শিল্পী হতে পারত। কেননা, একদিন আমার কণ্ঠে গাওয়া এক ভজন গান বাইরের কল ঘরে চান করবার সময় সে গুনগুন করে গাইছিল। আমি তখন ইস্কুল যাচ্ছিলাম। দরজার বাইরে ইস্কুলের গাড়ি দাঁড়িয়ে! সে গাড়িতে উঠতে সেদিন আমার দেরিই হয়েছিল।

বাইরে বারবার ইস্কুল বাসের হর্ণ বাজছিল আমাকে সতর্কিত করার জন্য। তবু আমি গাড়িতে উঠতে দেরিই করেছিলাম।

ড্রাইভার চিৎকার করাতে বলেছিলাম আসতে গিয়ে পড়ে গেছি, —'চোট লাগা হায়!' ইচ্ছে করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছিলাম। বড় লোকের মেয়ে,—ড্রাইভারের তাগিদে ছুটে আসতে গিয়ে পড়ে গেছি, পায়ে লেগেছে—এ যে ভীষণ ব্যাপার। ইস্কুলে কমপ্লেন গেলে শাস্তি পেতে হবে বাসের ড্রাইভারকে। তাই তাড়াতাড়ি সে নেমে এসে মোলায়েম আর অপরাধীর গলায় কসুর চেয়ে বলেছিল,

'কাঁহা চোট লাগা বাবা?'

'না, জব্বর চোট নেহি।'

তেমন কিছু নয় জেনে ড্রাইভার আর দারোয়ান আশ্বস্ত হয়েছিল। ইস্কুলের বাসও ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সারা পথ আমার কান জুড়ে ছিল মণির গুনগুন কণ্ঠধ্বনি—'ময়লি চাদর ওড়ক কৈসে!' আহা, কী আবেদন, ময়লা চাদর গায়ে দিয়ে তোমার দ্বারে কেমন করে হাজির হব? ঈশ্বরের কাছে এই আর্তি—এতো প্রেমিক মানুষের আত্মার আর্তি।

গানের এত গভীর ব্যঞ্জনা সেদিনের কিশোরী মনে অবিশ্যি উদয় হয়নি। আজ মনে পড়ে সে গানের যথার্থ মর্মবাণী।

মণি পানওয়ানির কাছে কাজ করছে। কত টাকা মাসমাইনে পায় তা আমার জানা নেই। তবু তাকে আমার নাচ গানের দলের ম্যানেজারের কাজ অবশ্যই দিতে পারি। তার মতন বিশ্বস্ত কর্মচারী পেলেও বরঞ্চ নিশ্চিন্ত হতে পারি।

এতো আমার কথা। মণির মনের কথা তো আমার জানা নেই।

তবে বেচারী মণিকে অন্তত পানওয়ানি সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া দরকার। সে কী জানে পানওয়ানির আসল ব্যবসা এবং পরিচয় কী? আর সে ব্যবসায় কত বিপদ আপদের আশঙ্কা। পুলিসের ভয়। আর একবার ওপথে গেলে কোন পথ আর খোলা থাকে না।

লক্ষ্ণৌতে একদিন আমি দেখেছি মণিকে। আমাদের পাড়াতেই মিসেস লাহিড়ীর বাড়িতে নতুন নতুন ডিজাইনের বোম্বে প্রিন্টের কয়েকখানি শাড়ি বেচতে এসেছিল। ভেবেছিলাম আমার বাড়িতেও হয়ত আসবে। কিন্তু বাইজী পরিচয় জেনে কী আসেনি? বাইজীকেই তো দামী শাড়ি কাপড়, ব্লাউজ, সায়া বেশি বেচা যায়। গৃহস্থ পরিবার যত ধনীই হোক না কেন তাদের সামর্থ তো সীমিত। আর,—তার তো জানা আছে ও পাড়ার ধনা মহিলা সম্প্রদায় বাড়িতে শাড়ি কাপড় কিনতে কী দর দস্তুরই না করে!

আমার বাড়ি মণি আসেনি। লাহিড়ী বাড়িতেই খানকয়েক শাড়ি বেচে চলে গেছে। আর পানওয়ানির আসল ব্যবসা জহরৎ জড়োয়া বেচতে হলে তো আমাদের মতন পরিবারের গৃহদ্বারই প্রশস্ত।

মণিমোহন এল না কেন তবে? সে তো বাইজী মুক্তোবাঈকে আগে দেখেনি। মুক্তোবাঈ-এর আসল পরিচয়ও জানে না। জানে যাকে—সে তো অতীত দিনের লালিমাকে।

লক্ষ্ণৌ ফৈজাবাদের বাড়িতে মণিমোহন আসেনি। কিন্তু তাকে

আমি দেখলাম গয়াতে। কাজরী গাইতে গিয়েছিলাম। সে গানের আর নাচের আসরে আমাদের বাবার দোকানের কর্মচারি আমরা যাকে নোকর বলতাম সেই মণি ছিল কিনা জানিনে।

গয়ার এক অভিজাত হোটেলের কয়েকখানি ঘর নিয়ে গাইয়ে নাচিয়ে পার্টি নিয়েছিলাম। দেখলাম মণিমোহনকে।

কি উদ্দেশে তার আসা বুঝলাম। প্রথমে শাড়ি বিক্রি, তারপর আসল ব্যবসার কথা পাড়ল। দলের কয়েকজন মেয়ে দু'-চারখানি শাড়ি ব্লাউজ পীস কিনল। কিন্তু আসল চীজ যখন বের করল, তার ক্রেতা কই? মণিকে দেখে আমি বের হলাম না। না, কিছুতেই তার সামনে আমি হাজির হতে পারলাম না।

ঘরের ভেতর থেকেই দেখলাম—সেই সুপুরুষ, সুঠাম যুবক। আঠার উনিশ বছর বয়েস থেকে এখন সাতাশ আটাশ বছরের সুশ্রী তরুণ।

'ইয়ে সচ্চা মুক্তা। আউর ইয়ে হীরা।'

মুক্তোবাঈ আমি এখন যদিও। কিন্তু আসল হীরে জহরৎ চেনা জানা ঘরের মেয়ে। বাবা কাপড়ের ব্যবসা করলেও খাঁটি জহুরি ছিলেন। এমন কি সিন্ধি আর গুজরাটী রত্ন ব্যবসায়ীরাও বাবার কাছে আসতেন আসল রত্ন চিনবার জন্যে। আমি তাঁরই মেয়ে। আর আমাদের ঘরে বড় কম মুক্তা, নীলা ছিল না। হীরেও ছিল। ছোট যদিও, কিন্তু আসল হীরে।

দলের ম্যানেজারই সাচ্চা মুক্তা আমার কাছে নিয়ে এল। হায়দ্রাবাদ থেকে আনানো হয়েছে।

আমি সহজেই চিনলাম। আসল মুক্তার সঙ্গে নকল মুক্তোর দামের তফাৎ আছে বৈ কি! তবু মণি বলবে—'ইয়ে আসলি মুক্তা। আউর হীরা ভি সচ্চা'।

আসল মুক্তা আর হীরে চেনাবে সামান্য দোকানের এক নোকর কর্মচারী? আশ্চর্য!

ভাবলাম নোকর মণিকে ডেকে বেশ করে ডেঁটে দিই—'আসলি আউর ঝুটা সমঝাবে চৈতমলকা লেড়কী কো?'

কিন্তু থাক—নোকরের সঙ্গে আর বাক্ বিতণ্ডায় কাজ নেই। তবু কী যে হল আমার—কিছুতেই মণিমোহনের সামনে বের হতে পারলাম না। আর বলতেও পারলাম না কিছু।

হীরে থাক। মুক্তোগুলো নিলে একটা নেকলেস করানো যাবে। আর ঝুটা হলেও কতই বা আর ঠকব আমি? কয়েক শ' টাকা। কয়েক শ' টাকা রোজগার করতে আর এমন কী মেহনৎ আমার?

তবু দরদস্তুর করলাম। তারপর কয়েক শ' টাকা ম্যানেজারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম মণিমোহনকে। আর ঝুটা জরির একখানি বাহারি ইণ্ডিয়ান বেনারসিও নিয়েছিলাম জেনে শুনেই সাচ্চা জরির দাম দিয়ে।

৩

॥ মণিমোহনের কথা ॥

কাজরিগানের আসরে কাকে দেখলাম আমি? এ কী সেই মেয়ে নয় যে আমাকে মণি বলে ডাকত।

আমার কি চোখের ভুল? না,—চোখ রগড়ে ভালো করে দেখলাম—হ্যাঁ সেই তো। সেই পদ্মকলি মুখ, সেই টিকালো নাক আর সেই আয়তা হরিণীর টানা টানা দুটি কাজল চোখের বাহার! পিঠে জরির লম্বা বেণী মাথায় সুচিক্কণ কেশদাম। একটা লাল টকটকে গোলাপ ফুল মাথার চুলে গোঁজা।

কিছুতেই ভুল হতে পারে না আমার। নর্তকী নয়, ডায়াসের সামনে বসে কাজরিগানের নেত্রী যে সুন্দরী তরুণী গায়িকা—কে সে?

ভুল হয়নি। দৃষ্টি ভ্রমও ঘটেনি। সে আমার প্রভুকন্যা চৈত্তমল লালভানি পরিবার জাত লালিমাই বটে। কিন্তু লালিমা নর্তকী হল কেমন করে? আর বাইজী হলই বা কেমন করে? আর বাইজী হলই বা কেন কনভেন্টে পড়া বড় লোকের মেয়ে?

চৈতমল বেঁচে থাকতেই তো লালিমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে বিয়ের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। কী জাঁকজমকের বিয়ে! আমরা সব কর্মচারীরা লালিমার বিয়ে উপলক্ষ্যে এক মাসের মাইনে বোনাস পেয়েছিলাম।

লালিমার স্বামীকেও দেখেছি বৈকি!

রাজপুত্তুরের মতন চেহারা। আর কী আদব কায়দা। বিলেত ফেরত জামাই। মেয়ের বিয়ে দিয়েই চৈতমল মারা গেলেন।

বোম্বাই-এর পার্সিবাগান থেকে লালিমা চলে গেছে শ্বশুর বাড়িতে সুরাটে। আমারও লালভানি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল। পার্সি বাগানের জীবন রইল পিছনে পড়ে। নতুন চাকরি নিলাম দাদার বাজারের বিগ ক্লথ মার্চেন্ট নাথুমল পানওয়ানি কনসার্নে।

মাস মাইনে আরো কিছু বেশি, কাজ কিন্তু একই ধরনের। সেই শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা, সায়া নিয়ে শুধু বোম্বে মার্কেটে নয় ভারতের সকল প্রদেশেই যাওয়া আসা। খুচরো বিক্রি অপেক্ষা হোলসেলের দিকেই নজর বেশি। তবু কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত এবং আধুনিক পরিবারের রমণী-ক্রেতার মন আকর্ষণ করতে পারলে পাবলিসিটি হয় ভালো। তাই দোকানে দোকানে যেমন যাই, তেমনি রুচিসম্পন্ন মহিলাদের আবাসেও শাড়ি কাপড় নিয়ে সেলসম্যানগিরি করি।

এসেছিলাম লক্ষ্ণৌতে। আমিনাবাদ বাজারে জমকালো সব শাড়ি কাপড়ের বড় বড় দোকান। লক্ষ্ণৌ-এর চিকন শাড়ির সঙ্গে বোম্বে সিফনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আমিনাবাদ বাজারে কাজ ভালোই হয়েছিল। সেইখানেই শুনেছিলাম ফৈজাবাদ কলোনির কথা। নতুন নতুন বাড়ি ঘর। নয়াপল্লী। নতুন বাড়িতে রুচিসম্পন্ন বাঙালী পরিবারও অনেক বাড়ি করেছেন। আর বোম্বে শাড়ির প্রতি বাঙালী মেয়েদের অনুরাগই বেশি।

শুধু শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া, ব্রা নয় আর একটা বিজনেস-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি আমি নাথুরাম পানওয়ানির কনসার্নে এসে। জুয়েলারি

বিজনেস। হীরে, মুক্তো, চুনী, প্যান্না—কোনটি নকল কোনটি আসল চেনা ভার। আর কোথা থেকে নাথুরাম আনে এগুলি তারও হদিস কিছু কিছু জেনেছি। তবে সে সব জায়গায় ভয়ানক বিপদ আপদের আশঙ্কাও আছে। ইনটার ন্যাশন্যাল কালোবাজারী মার্কেট। পুলিশ, সি, আই, ডি ঘোরাঘুরি করে।

শাড়ি বেচে আর কত রোজগার হতে পারে? তার চেয়ে এই বিজনেসে হাত পাকাতে পারলে ওড়া পয়সা ধরা দেয়। তখন আর আমি কলকাতায় এক ভাঙা বাড়ির একতলার মোট দু'খানা ঘরের ভাড়াটিয়ার একমাত্র উপার্জনশীল পুত্র সন্তান নই। হা অন্ন, হা অন্ন করে শাড়ির গাঁটরি নিয়ে এ-জায়গা ও-জায়গায় ঘুরে-ফিরে আর বেড়াতে হবে না আমাকে।

লক্ষ্ণৌতে অনেক বারবণিতা এবং বাঈজী সম্প্রদায়ের বাসস্থান। লক্ষ্ণৌ আর বেনারস বড় খানদানি জায়গা। বিহারে গয়াতেও এ-ব্যবসা চলে ভালো। আর খোদ বোম্বাই-এতে তো আছেই। কিন্তু বড় রিস্কের কাজ। তবে 'নো রিস্ক নো গেইন!' কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে কী? এ-ব্যবসা জমাতে পারলে শাড়ির গাঁটরি নিয়ে আর ঘোরাফেরা করতে হবে না। ছোট একটা এ্যাটাচি কেস, তাতেই কিছু জুয়েলারি জেমস—দিনে একটা খদ্দেরই যথেষ্ট।

কলকাতায় সুরি লেনের একতলার স্যাঁৎসেঁতে দুখানা ঘর নয় আর। পান্নাকে উপযুক্ত ঘরে বিয়ে দিয়ে বাবা-মাকে নিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারব বোম্বাই শহরে। জুহুর কাছাকাছি সুদৃশ্য একটা দোতলা ফ্ল্যাট—আরো ভাল হয় যদি মালটি স্টোরিড বিল্ডিংসের আট তলায় ওঠা যায়। চোখের সামনে সমুদ্র—ঢেউ আর ঢেউ। আর তার সঙ্গে ঊর্মিমুখর জীবন। ঢেউ-এর দোলায় দোল খাওয়া।

হুড খোলা রেসিংকার। বড় গাড়ির দরকার নেই। বুড়ো বাপ-মা বোম্বে শহরে কোথাই বা যাবেন? কালীঘাটের গঙ্গাও নেই, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কিংবা বেলুড়মঠও নেই যে বড়

এ্যামবাসাডারে গুষ্টি সুদ্ধ সবাই চড়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে মনের সঙ্গিনী নিয়ে রেসিং কারে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা—কমলা নেহেরু পার্ক। ছেলেপুলের বালাই নেই, নেই কোন উটকো ঝঞ্ঝাট। আজকাল আর কেউ একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করে হিমসিম খায় না। গোনাগুনতি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে তাই যথেষ্ট। তাও বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই নয়।

বেশ কয়েক বছর চখাচখি মিলে ফুর্তি করে দিন কাটিয়ে যাও। ইট ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বি মেরি। জীবনকে উপভোগ করো আগে। আর স্ত্রী মানে নয় বাপ মায়ের পছন্দ করা মেয়ে। জাত ধর্ম ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে বিয়ে করা হ্যাকনিড ব্যাপার। একেবারে সেকালের বর্বর প্রথা। কেন? ব্রাহ্মণ হলে ব্রাহ্মণ কন্যাকেই যে বিয়ে করতে হবে তার কি মানে আছে? বাঙালী ছেলে শুধুমাত্র বাঙালী মেয়েকেই বা বিয়ে করবে কেন? যাকে খুশি বিয়ে করাই তো ভালো। দেহ আর মন যার সঙ্গে যার মিলন।

ফ্রী লাভ তারপর ফ্রী চয়েস। বাঙালী ঘরের মেয়ে তা যতই শিক্ষিত হোক না কেন সিন্ধি, পার্শী, গোয়ানিজ এমন কি মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের মতন বেপরোয়া হতে পারে না। শ্ল্যাক পড়ে বাঙালী মেয়েরা ঘুরে ফিরে আজকাল বেড়ায় বটে, বেল বটস্‌ও পরতে দেখা যায় তাদের অঙ্গের বেশভূষায়, কিন্তু সবই আইবুড়ো মেয়ের বেলায়। বিয়ে-থা হয়ে গেলে তাদের সাজ-সজ্জা একেবারে কলা বউ সাজা যেন!

মধ্যপ্রদেশেও মাঝে মাঝে যাই—ইন্দোরে গিয়ে সেবার একটি মেয়ে ক্যানভাসারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। একই হোটেলে আমরা ছিলাম। মেয়েটির বাড়ি ভুপালে। লম্বা একহারা চেহারা—রঙ যেন ফেটে পড়ছে। দোষের মধ্যে চোখ দুটি একটু ছোট। কিন্তু দুপুরে যখন গো-গো সান গ্লাস চোখে দিয়ে বেলবটস্‌ পরে ট্যাক্সিতে চাপত—তখন তার দিকে কার সাধ্যি চেয়ে চেয়ে না দেখে। চলন্ত ট্যাক্সিতে উড়ে চলেছে এক প্রজাপতি মেয়ে

প্রজাপতি আঁকা কোট গায়ে দিয়ে।

একই হোটেলে আমরা ছিলাম। ভিন্ন কামরায়। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম আমি। শাড়ির বাণ্ডিল নিয়ে ইন্দোরের রাজপথে দুপুর রোদে টো টো করে ঘুরে ফিরে হোটেলে ফিরতেই আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা আর গা বমি বমি ভাব। মাথার যন্ত্রণা না হয় দুপুরের রোদে ঘুরে। ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমন কিছু হয়নি। তবুও খিদের মাথায় গরম পুরি আর রাবড়ি খেয়েছিলাম। বাঙালীর ছেলে—মিষ্টির মধ্যে রাবড়ি বড় প্রিয়। ইন্দোরে রাবড়ি বেশ শস্তা। তাই লোভ সামলাতে পারি নি। তার জন্যেই কী এই গা বমি বমির ভাব।

উঠে কল ঘরে যেতে না যেতেই যাতায়াতের পথে বারান্দায় হড় হড় করে বমি করে ফেললাম। পাশের ঘরের মধ্যপ্রদেশীয় তরুণী মেয়েটি ছুটে এল। আর আশ্চর্য, রাস্তায় যে মেয়েকে উড়ন্ত দেখেছিলাম এখানে সে সত্যি কত সহজভাবে পরম মমতার কণ্ঠে বলল, 'ইনডাইজেস্‌সন। বিলকুল খানামে।'

'হ্যাঁ।' রাবড়ি খাওয়ার কথা অকপটে বললাম।

'ঘাবড়ায়ে মাৎ। হামারা পাস দাওয়াই হায়।'

'ওষুধ? কী ওষুধ?'

মেয়েটি জানাল, তা জানার দরকার আমার নেই। কেননা, সে ডাক্তার না হলেও সব ওষুধের গুণাগুণই তার জানা। 'ইনডাই-জেস্‌সন,' 'এ্যাসিডিটি,' আর মাথা ধরা—এতো অতি কমন ডিজিস। এর ওষুধ জানবার জন্যে আর কাউকে ডাক্তারি পড়তে হয় না।

মেয়েটি তক্ষুনি হোটেলের জমাদারকে ডেকে এনে বারান্দা পরিষ্কার করানোর কাজে লেগে গেল। আমার বিছানার চাদর পালটে পাখার পয়েন্ট আরো একটু কমিয়ে দিয়ে আমাকে শুইয়ে দিল।

তারপর তার ব্যাগ নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। কত রকমেরই না ওষুধ।

'এত ওষুধ কিসের? ডাক্তারি করা হয় নাকি?'

'নেহি। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ।'

মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ? তাহলে তো একই নৌকোর জীবন যাত্রী আমরা। আমি না হয় একটু নীচু শ্রেণীর। তবুও আমার ডেজিগনেশনও তো রিপ্রেজেনটেটিভ।

'আপ?'

শাড়ি কাপড়ের গাটরি দেখিয়ে বললাম, 'ক্লথ মার্চেন্টস্ রিপ্রেজেনটেটিভ।

মৃদু হেসে মেয়েটি বলল, 'একই সড়ক।'

আশ্চর্য ব্যাপার, মাত্র দুটি ক্যাপসুল খেয়েই আশ্চর্য উপকার বোধ করলাম। আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙতেই মেয়েটি এসে আমার দরজায় দাঁড়াল।

তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গিয়ে রাত হয়েছে।

'আচ্ছা তো?'

'বহুত মেহেরবান।' আবেগে বাংলার পরিবর্তে হিন্দি ভাষাই কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল।

ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে আহ্বান জানালাম। মেয়েটি বলল, 'নেহি! আভি নেহি!'

রাত হয়ে গেছে। এখন আমার বিশ্রাম নেওয়ার দরকার। আজ রাতে আব জল স্পর্শও নয়। মেয়েটি আমাকে ঘুমোবার ওষুধ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরদিন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। চায়ের টেবিলে আমন্ত্রণ জানাতে সে বেশ খুশি মনেই প্রাতঃরাশে আমার সঙ্গে একত্রে চা পান করেছিল।

কতক্ষণেরই বা আলাপ পরিচয়?

তার পরের দিন আমি ইন্দোরে থাকলেও মেয়েটি আর থাকতে পারেনি। সকালবেলা কিছুক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম। মেয়েটিকে কাজে বেরুতে হয়েছিল।

আমাকে সে উপদেশ দিয়েছিল সেদিন যেন আর দুপুরের রোদে কাজে না বেরুই। অন্তত একদিন বেড-রেস্ট নেওয়া দরকার। হেসে বলেছিল, 'এণ্ড ইটস এ মেডিকেল এ্যাডভাইস ফরম এ মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ ফ্রেণ্ড।'

মধ্যপ্রদেশীয় কুমারী মেয়ে বাপের বাড়ি সংসার প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিয়েছে। গরিব অকর্মণ্য বাপ অসুস্থ, অসমর্থ। কোন এক ওষুধের কারখানায় কাজ করতেন। হঠাৎ এ্যাক্সিডেণ্টে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছেন। মাথারও ঠিক নেই তাঁর। মেয়েটি ইস্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়ছিল। বাড়ির বড় মেয়ে সে। তার পিঠোপিঠি আরো চারজন ভাই বোন। বাপ মাকে নিয়ে সাতজনের সংসার। অবিশ্যি ভূপালের অন্তর্গত গ্রাম্য বাড়িটি তাদের নিজস্ব। বাড়ি ভাড়া দিতে হয়না। তবু তো সাতজনের খোরাক-পোশাক যোগানো—একটি মেয়ের পক্ষে তা সহজ কথা নিশ্চয়ই নয়।

বাবা যে ওষুধের কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন, সেই ওষুধের কারখানাতেই মেয়েটির চাকরি হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে ভূপালের এক কেমিক্যাল ফার্ম। শ্রমিকের কাজ নয়। মেয়েটি কলেজী শিক্ষা নিয়েছে। দেখতে শুনতে স্মার্ট, কথাবার্তা বলতে পারে ভালো। কিছুদিন ট্রেনিং নিয়ে তাকে বেশ কাজের মেয়ে তৈরী করা হয়েছে। এখানে-ওখানে এখন একলা বেশ চলতে পারে, ইংরিজি বলতেও পারে কাজ চালানো গোছের। তাই মেয়েটিকে ওই কেমিকাল ফার্মের মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। মাত্র মাস ছয়েক হল সে কাজে ভর্তি হয়েছে। ভূপাল শহর থেকে বিদিশা, বিদিশা থেকে উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোর ট্যুর প্রোগ্রাম. এদিকেই এখন শুধু ঘুরছে ফিরছে আর ওষুধ বিক্রি করছে। রাত্রি বাস করতে হচ্ছে হোটেলে হোটেলে। ট্রেন, ট্যাক্সি, আর বাসে বাসে ঘোরাফেরা—তাও একা একাই। মাস মাইনের সঙ্গে ট্র্যাভলিং এলাউন্স, ফুডিং লজিং-এর সমস্ত খরচই কোম্পানী বহন করে,এর সঙ্গে আবার সেলিং কমিশনও আছে। শুনলাম, কুড়িয়ে

বাড়িয়ে মেয়েটি হাজারখানেক টাকা রোজগার করে। ছ মাসে এই। ভবিষ্যৎ তার নিশ্চয়ই উজ্জ্বল।

আমি নিজের কর্মজীবনের সঙ্গে মেয়েটিকে মিলিয়ে দেখলাম—আমার চেয়ে কম রোজগার সে নিশ্চয়ই করে না। তাও শুধু শাড়ি, ব্লাউজ পীস, সায়া আর ব্রা বিক্রি করে মাসে এত টাকা কখনো আমি রোজগার করতে পারিনি। আমি—যে-আমি সেলসম্যানের কাজে এতদিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম সেই আমাকেও উপরি রোজগারের জন্যে পানওয়ানির গোপন ব্যবসার কাজ গোপনে করতে হচ্ছে—যাতে পুলিশে ধরা পড়ার ভয় আছে।

মধ্যপ্রদেশের মেয়েটিকে দেখে আমার বোন পান্নার কথা মনে পড়ল। পান্না কেন কলকাতায় সুরি লেনের একতলার অন্ধকার ঘরে নিষ্কর্মার জীবন যাপন করছে? পান্নাও কি সংসারের আয় বাড়াতে পারে না? কবে বিয়ে হবে—বাঙলা দেশের কোন রূপবান ব্রাহ্মণ সন্তান কবে তার কুমারীজীবনের শিব পুজোকে সার্থক করবে এরই তপস্যায় দিন গোনার চেয়ে যে-কোনো কাজকর্মে নিযুক্ত হওয়া কী ভালো নয়! কিন্তু সে চেষ্টাই বা করে কে? আর কেন বা করবে? দু' বেলা অন্ন সংস্থান আর বেশভূষা যোগান এবং সংসার যাত্রা নির্বাহের ব্যয়ভার যার মাথায়—সেই কেন ভাবুক না সুরি লেনের মুখুজ্জে পরিবারের কথা।

কলকাতার সুরি লেনের শুধু মুখুজ্জে পরিবার কেন? কলকাতা আর বঙ্গভূমি জুড়ে কত কত পরিবারেরই না এই একই অবস্থা। একজনের রোজগারে পাঁচজন দশ জনের ভরণ-পোষণ। অথচ অর্থ রোজগারের কত পথই না খোলা। স্যার পি, সি, রায় আপসোস করেছিলেন—চাকরি মানে পরের গোলামী না করে বাঙালী কবে ব্যবসার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হবে! রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন, 'দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে!'

মধ্যপ্রদেশীয় মেয়েটির প্রতি সম্ভ্রমবোধ জেগেছিল আমার মনে।

অবিশ্যি বঙ্গ রমণীরাও আজ একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে ঘরেবসে নেই। অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে তারাও আজ অনেকে জীবনযুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। অনেক বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির সংসার খরচ চলছে বঙ্গদেশে এখন বঙ্গ রমণীর আয়ে—সে খবর যে একেবারে রাখিনে তা নয়। তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মেয়েরা—যারা লেখা পড়া শিখেছে পাশ্চাত্যয়ানায় তারা আরো অনেক এগিয়ে গেছে। অনেক বেশী ড্যাসিং এবং পুসিং তারা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পান্নার কথা ভাবছিলাম। পান্নাকে শুধুমাত্র সুরি লেনের হেঁসেল ঠেলার কাজে আবদ্ধ রাখা আর উচিত নয়। মেয়েটা একেবারে ডিপ্রেসড হয়ে পড়বে।

৪

॥ 'পান্নার কথা ॥

আমি পান্না। দাদার নাম মণি। দুই ভাইবোন আমরা।

দাদাকে দেখতে সত্যিই সুন্দর। সুপুরুষ যুবক সাতাশ-আটাশ বছর বয়েস। প্রথম যৌবন থেকেই দাদাকে জীবন-সংগ্রামে লড়তে হচ্ছে। বেচারি বোম্বাই-এর এক সিল্কি কাপড়েরদোকানের ক্যানে-ভাসার। আহা, কত কষ্ট করেই না তাকে রোজগার করতে হয়! তার রোজগারেই মধ্য কলকাতায় এই সুরি লেনের সাবেককালের জীর্ণ দোতলার বাড়ির একতলায় দু'খানা ঘরে আমাদের সংসার চলে। বেচারি দাদা লেখা পড়ায় খারাপ ছেলে ছিল না। হায়ারসেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাশ করেই কাজে নামতে হয়েছে তাকে। বাড়িতে থাকে সে আর কতদিন? আমি তবু সংসারে থেকে দুঃখের অন্ন মুখে দিয়ে পরি-তৃপ্তির সঙ্গে দু'বেলা খেতে পাই।

আর দাদা? মাসের তিরিশ দিনের মধ্যে ছাব্বিশ সাতাশ দিনই বাইরে বাইরে তাকে থাকতে হয়। এ দেশ সে দেশ ঘুরে ফিরে শাড়ি

ব্লাউজ বেচতে হয়। ক'টাকাই বা মাইনে? তবে উপরি আয় আজ-কাল বুঝি কিছু কিছু হচ্ছে।

এত খাটাখাটনিতেও দাদাকে এখনো যেন রাজপুত্তুরের মতন দেখায়। রাজপুত্তুরের চেহারা আমার দেখা নেই। তবে বড় লোক ধনী বংশের রূপবান যুবকের চেহারা আমি দেখেছি তো। এই তো সেদিনই দেখলাম জোড়াসাঁকোর রাজবংশের এক ছেলেকে। আপেলের মত গায়ের রঙ,—সাদার ওপর লালচে গোলাপী আভা! আর সিনেমার হিরো উত্তমকুমার। দাদাকেও ঠিক সেই রকম দেখতে। দাদা যদি সিনেমায় চান্স খুঁজতো, তা হলে নায়ক সেজে কত পয়সাই না রোজগার করতে পারতো।

আচ্ছা, দাদা কেন ও লাইনে গেল না? কলকাতায় চান্স না পেলেও বোম্বেতে চান্স পাওয়া কী এতই কঠিন কাজ। শাড়ি বেচতেও তো অভিনয় করতে হয় তাকে। কাঁচা রঙকে পাকা বলে চালাতে হয়। নকল জরিকে সাচ্চা জরি করে তুলতে হয়। এও কী অভিনয় নয়?

বোম্বেতেই তো দাদার আসল কর্মক্ষেত্র! সেখানে একটু চেষ্টা চরিত্র করলে যে কিছুই হবে না এমন কথা কে বলতে পারে।

বাবা মা শখ করে আমাদের দু'ভাইবোনের নাম রেখেছিলেন মণি আর পান্না। দাদার যা চেহারা এখনো তাতে মণি নাম তার অসার্থক নয়। কিন্তু আমি পান্না—এ যেন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। অন্তত দাদা মণির পাশে পান্না আমি নিতান্তই নিষ্প্রভ!

গায়ের রঙ ময়লা, চেহারা অবিশ্যি লম্বা, কিন্তু হাড়ে তো মাংস নেই। তবু দাদা বলে, 'কি সুন্দর চোখের বাহার! পান্না! পান্নার মতন জলজ্বলে চোখ দুটি তোর।'

এ তো দাদার বোনকে ভালবাসার কথা। অকৃত্রিম স্নেহ।

প্রবীরকে একদিন আমার সঙ্গে মেট্রো সিনেমার সামনে দাদা দেখে ফেলেছিল। প্রবীর আর আমি দুজনে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিলাম সেদিন। প্রবীরকে উপলক্ষ্য করে দাদা একদিন ঠাট্টা করে

বলেছিল আমাকে, 'যাক পান্না, তোর গতি তুই নিজেই করে নিয়েছিস। খুশি হয়েছি আমি। ছেলেটি তো দেখতে শুনতে বেশ! কী করে রে?'

প্রথমে চাপতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দাদা এমন সহানুভূতিশীল, এমন দরদ যার ছোট বোনের প্রতি, এত উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি যে প্রবীর ব্রাহ্মণ বংশের না হলেও তার সঙ্গে আমার বিয়েতে দাদার আপত্তি নেই, আর নিজে চোখে দেখেও যে কথা দাদা ঘুণাক্ষরে বাবা মাকে জানতে দেয়নি সে-দাদার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলা অন্যায়; শুধু অন্যায় নয় তা পাপই।

দাদাকে তাই অকপটে বলেছি প্রবীর সম্পর্কিত সব কথাই।

প্রবীরের বোনের সঙ্গে স্কুলে পড়তাম আমি। ওদের বাড়ি কয়েকবার গেছি আমি গোপ লেন, এন্টালি বাজারের কাছে। অবস্থা ওদের ভালোই। প্রবীর গ্রাজুয়েট। এল, আই, সি তে চাকরি করে।

আমার আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কলেজে পড়া হল না। প্রবীরের বোন মঞ্জু লেডি ব্র্যাবোর্নে পড়ে। কিন্তু এখনও বন্ধুত্ব আছে মঞ্জুষার সঙ্গে আমার। আদান প্রদান এবং আসা যাওয়াও আছে। প্রবীর মাঝে মাঝে বোনকে বাদ দিয়ে একাই আমাকে সিনেমা দেখায়। কফি-ডি-মনিকোতে কফি ফিস ফ্রাই খাওয়ায়। আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যায়। গঙ্গার ওপর ঝুলন্ত রেস্তোরাঁতে কোল্ড ড্রিঙ্ক, আইসক্রিম এবং চিকেন রোস্ট খেতে খেতে জীবনের মধুসন্ধ্যা যাপন করেছি প্রবীরের দৌলতে।

প্রবীর কথা দিয়েছে যে সে তার জীবনের সঙ্গিনী করবে আমাকে।

দাদা বলেছে, 'দাঁড়া কিছু উপরি রোজগার করি। রেজেস্ট্রি ম্যারেজ হলেও বাপের বাড়ির তরফ থেকে কিছুই পাবিনে তা হতে পারে না।'

সেই উপরি রোজগারে দাদা এবার বের হয়েছে। বোম্বাই থেকে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গয়া হয়ে ফিরবার কথা। দাদা হয়ত বোনের

বিয়ের যৌতুক নিয়েই ফিরবে।

আসল না হোক পান্না নামের সঙ্গে মিল রাখতে নকল পান্নার কানের ফুল নিয়ে আসবে বোম্বাই থেকে, আর সাউথ ইণ্ডিয়ান ঝল-মলে বেনারসী শাড়ি। একটা পার্টিও হয়ত দেবে চৌরঙ্গীর কিংবা পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্তোরাঁতে।

কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে দাদার উপরি রোজগারের তাগিদ সে কোথায়? দাদাকে কেমন করে বলবো মেয়ে মানুষের জীবনের এ পরাজয় এবং লজ্জার কথা। কেমন করে বলবো আমি যাকে দেখে মজেছিলাম সে কোন পুরুষরত্ন নয়, সে পশু। পশুর মতই তার ব্যবহার। শুধু জৈবিক ক্ষুধার তাড়না। ভাগ্যিস চরম পাওনা দিই নি তাকে। আজ তাহলে কি দশা হত আমার।

বাপের এক তাড়াতেই প্রবীর তার মত পরিবর্তন করেছে। কুলীন কোন ধনী রূপসী কায়স্থ কুমারীর সঙ্গে তার বাবা ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে তুলেছেন।

দুঃখ আমার নিজের জন্যে নয়। দুঃখ দাদার জন্যে। আর লজ্জায় দাদার সামনে দাঁড়াবো কোন মুখে। কিন্তু উপায় বা কি?

কালকে খুব প্রাকৃতিক দুর্যোগ গেছে। ঝড়, জল, বৃষ্টি। সাই-ক্লোনে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়েছে। আজকের সকালের খবরের কাগজে পড়লাম চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা। মনটি দাদার জন্যে খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে রেডিওতে খবর শুনে বাবা মা তো সকাল থেকেই কান্না শুরু করেছেন—মণি কেন এখনো এলো না?

এ কী! খবরে দেখছি যে গয়া থেকে হাজারিবাগের পথে বোম্বে মেইলের ডিরেল্ড্ হওয়ার কথা। কিছু হতাহতের সংবাদও আছে। তবে দাদার নাম নেই তাতে। তাহলে কী হয়? দাদা যখন কাল ফেরেনি আজ খুব ভোরে তো তাকে নিশ্চয়ই আসতে হবে। সকলেই হাওড়া স্টেশনে পানওয়ালির লোকের সঙ্গে দাদার মীট করার

কথা।

দাদা কি তাহলে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে পানওয়ানির লোকের জন্য অপেক্ষা করছে?

. . . .

ঘড়িতে সকাল আটটা বেজে গেল। আর সুস্থির থাকতে পারছে না আমার মন। কোন এক অমঙ্গলের ভার আর যেন বইতে পারছিনে।

মাকে গিয়ে বললাম, 'আমি যাই হাওড়া স্টেশনে।'

মা বাধা দিলেন, 'তুই কোথায় যাবি একেলা মেয়েমানুষ?'

'কেন, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি দাদা এলো কিনা!'

'হাওড়া স্টেশনের জনারণ্যে কোথায় খুঁজবি তাকে?'

'সে আমি ঠিক খবর নিয়ে আসব।'

আমার কথায় মা তেড়ে উঠলেন। খেঁকাতে শুরু করলেন বাবাকে, 'নিজে সোমত্ত পুরুষ ঘরে বসে নিশ্চিন্তে হুঁকো টানছো, আর ছেলেটার যে কি হল তার জন্যে ভ্রুক্ষেপ নেই।'

অগত্যা বাবাকে জামাকাপড় পরে দু'চারটে টাকা ট্যাঁকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের পথে ছুটতে হয়েছে।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই বাবা বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে অবিশ্যি একজন বয়স্ক যুবক আছে। কিন্তু দাদা? দাদা কই?

মা ছুটে এলেন—'হ্যাঁগা, খবর কি?'

বাবার সঙ্গে অপরিচিত তরুণ যুবককে দেখে আমি আর ঘরে আবদ্ধ থাকতে পারলাম না। যদিও আমাদের ঘরের প্রথা অপরিচিত যুবকের সামনে অপ্রয়োজনে মেয়েদের বের হওয়া কিংবা কথা বলা নিষেধ, আমি কিন্তু স্থির থাকতে পারলাম না। বাবার সামনে এসে বললাম, 'বাবা দাদা আসেনি!'

বাবা বললেন, 'না।'

আশঙ্কায় এবার আমার বুক কেঁপে উঠল, 'কি হয়েছে দাদার?

দাদা আসেনি কেন ?'

বাবার সঙ্গে যুবকটি আমাকে অমন অধৈর্য দেখে বললেন, 'কুছ কামসে জরুর ভিটেও হো গেয়ি।'

'দাদা কোথায় কাজে গেছে ?'

'ও ভি ঠিক মালুম নেহি।'

তবে ?

বাবা আমাকে বললেন, 'তুই ঘরে যা পান্না।'

মা বিরক্ত হলেন, 'সব তাতে তোর বাড়াবাড়ি। আমরা রয়েছি কী করতে ?'

হ্যাঁ, তা ঠিক কথা বলে। তবে মা বাবা যে কেন বোঝেন না তাঁদের চেয়ে আমার জীবনে দাদার ভরসাই বেশি।

ঘরের মধ্যে গেলাম বটে কিন্তু কান খাড়া রইল বাবা-মার সঙ্গে যুবকটির কথাবার্তা শোনার জন্যে।

বোম্বাই থেকে মাল নিয়ে দাদা বেরিয়েছে ক্যানভাসিং ট্যুরে। প্রথমে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে গয়া হয়ে কলকাতায় আসার কথা। আর আজ সকালে হাওড়া স্টেশনে আগন্তুক যুবকের হাতে ফিরতি মাল পত্তর এবং টাকার হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে দাদার কলকাতার বাড়িতে আসার কথা। দাদা নাকি বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্যে মনিবের কাছ থেকে একমাসের ছুটি নিয়েছে।

বোম্বাই থেকে আগত যুবকের কথায় আমার মনটা আরো দমে গেল। কার সঙ্গে দাদা বোনের বিয়ে দেবে ? কোন সে পাত্র ? দাদা তো প্রবীরের শঠতার কথা জানে না।

বাবা মার দুর্ভাবনা তখন ছেলের ফেরার জন্যে। দাদার কোলিগ সহকর্মীর দুর্ভাবনা মাল বেচার হিসেব নিকেশের কথা ভেবে। আর আমার দুশ্চিন্তা যে আরো গভীরে। কী করব এখন ? এ বাড়ির গলগ্রহ হয়ে এ ভাবে আর কতদিন জীবন চালাবো ? এতবড় কলকাতা শহরে আমার জন্যে কী কোন জায়গাই নেই ?

দাদার সহকর্মী দুপুরে আহারাদি সেরে আবার রাত্রে বোম্বে মেলে বোম্বে ফিরে গেল।

বাপ-মায়ের নিষেধের কথা শুনিনি।

দাদার সহকর্মী যখন আমাদের বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশনে যাত্রার উদ্যোগ করছে আমি তখন হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বোম্বে দাদার স্টেশন থেকে পানওয়ানির কাপড়ের আড়তের পথ ভালো করে জেনে নিলাম। প্রয়োজন হলে দাদার হিসেব নিকেশ নিয়ে আমি সেখানে যাব।

দাদার সহকর্মী আশ্বাস দিল যে পানওয়ানি এত খারাপ লোক নন যে সহজেই তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীর প্রতি বিরূপ হয়ে এখুনি হিসেব নিকেশ পাওনা গণ্ডার জন্যে পুলিশ কোর্ট আর মামলা দায়ের করে বসবেন। হয়ত কাজে আটকে গিয়ে মণি কলকাতায় ফিরতে পারেনি।

কিংবা হয়ত বা সে আবার বোম্বাই দাদারেই ফিরে গেছে। হিসেব পত্তর বুঝিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরবে।

হতে পারে। দুটোই সম্ভবপর।

কিন্তু পরের দিন তো দূরের কথা! প্রায় এক সপ্তাহ হতে যায় দাদার আর কোন পাত্তাই নেই।

কি হল দাদার? সে খবর কোন জায়গা থেকেই সংগ্রহ করতে পারিনি। দাদার থেকে ঘন ঘন চিঠি এবং টেলিগ্রাম আসছে দাদার খবরের জন্যে।

আমরা সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। মা তো পাগলের মতন আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছেন। মাথার ঠিক নেই তাঁর। বাবা কী করবেন? এক একবার আসেন আমার কাছেই বুদ্ধি পরামর্শ নিতে।

বাবাকে বলি, 'আমিই তাহলে যাইনে কেন?'

'কোথায়?'

'বোম্বেতে। দাদার মনিবের কাছে।'

'সে কী রে! তুই পথ ঘাট কী চিনিস? আর বোম্বে গিয়ে

করবি কী ?'

বাবার কথায় আমার আশঙ্কাটাকে প্রকাশ করে বলি, 'দাদা যদি কোন কুসঙ্গে পড়ে থাকে ?'

খানিকক্ষণ কী যেন ভাবতে থাকেন বাবা, 'হ্যাঁ, অসম্ভব নয়। তা হলে তো পুলিস কেস হবে রে ? মণির জেল হয়ে যাবে।'

বাবার কথা শুনে মা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

বাবা বললেন, 'তা হলে উপায় ?'

আমি বললাম, 'আমিই যাই বাবা। হাতে পায়ে ধরে কোন রকমে পানওয়ানি সাহেবকে পুলিশ কেস করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব।'

আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'তা হলে বলিস তো আমিই যাই।'

'আমাদের দুজনকে ফেলে তুমি গেলে দুদিকেই অসুবিধে বাবা। তার চেয়ে আমার যাওয়াই শ্রেয়। আর মেয়ে ছেলে দেখলে পান-ওয়ানি সাহেব হয়ত সহজে দয়া করবেন,—দাদার ব্যাপারে বরঞ্চ সাহায্যই করবেন।'

আমার বোম্বাই যাওয়াই সব দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখে শ্রেয় বলেই স্থির করলাম।

জীবনে আমার এত দূরতম ট্রেন যাত্রা ঘটেনি।

মধ্য কলকাতার সুরি লেনের বাসিন্দা। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের কুলীন কন্যা। একা পথ চলায় অভ্যস্ত নই। কলকাতার কাছাকাছিই বা একলা একলা কবে কোথায় গিয়েছি ? কোন আদিম কালে একবার বাবার সঙ্গে সপরিবারে আমরা বিহারের সাঁওতাল পরগণার শহর বৈদ্যনাথ ধামে গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম উইলিয়মস্ টাউনের এক ধর্মশালায়। তাইতেই বাইরে বেড়ানোর কী আনন্দ! আর কদিনই বা ছিলাম আমরা। চার পাঁচ দিন মাত্র। বাবা তখন বিলিতি অফিসের স্টোর কীপার।

দেওঘরে উইলিয়মস্ টাউন থেকে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে গিয়েছিলাম। নন্দন পাহাড়ে উঠে পাহাড় দেখার আনন্দ অনুভব করেছিলাম। বমপাস টাউনের মায়া পাহাড়ের শিলাস্তূপে আমি আর দাদা খড়ি দিয়ে নিজেদের নাম ঠিকানা লিখেছিলাম। ক্যাসটাস টাউনে এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারে গিয়ে আলাপ জমিয়ে চা-হালুয়া আর দেওঘরের প্যাঁড়া খেয়েছিলাম। ধারোয়ার ঝির ঝির জলে পা ডুবিয়েছিলাম। জীবনের সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

বোম্বে মেইলে চেপে কত দূর দূরান্তের পথে চলেছি। এলাহাবাদের আগে প্রয়াগ। সারা রাত চোখে ঘুম নেই। নদী, এক একটি তীর্থভূমি, প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভার পিছিয়ে যাওয়া সব রেল স্টেশন এ-সব দেখার মতন চোখ কোথায় আমার? সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল তারপর সন্ধ্যা এবং রাত্রি—দু'দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। মনে কতই না দুশ্চিন্তা! কী করব বোম্বাই গিয়ে? পানওয়ালি সাহেবকে কি বলব? যদি তাঁর সহৃদয় আশ্রয় না মেলে তবে বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় গিয়ে উঠব? দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা।

বোম্বে দাদার স্টেশনে নেমে পানওয়ানির কাপড়ের আড়ৎ খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

শহরের রাজপথে একটু খোঁজ খবর করতেই দাদার প্রভু নাথমল পানওয়ানির দোকানের সন্ধান মিলল।

যে ভয় পেয়েছিলাম তা কিন্তু অমূলক। পানওয়ানিও প্রৌঢ় ব্যক্তি। আমার পরিচয় পেয়ে সস্নেহে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। দাদার জন্যে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় তাঁর দিন কাটছে।

বললেন, 'কুছ গড়বড়। জরুর কুছ হুয়া, নেহি তো মণি এইস্যা ঝুটা আদমি নেহি। একদম সাচ্চা। বেচারি কই ফের মে

গিরা। ডরো মাৎ বেটি—মায় যো কুচ করনা সমুচিত, ওহি করেঙ্গা।'

পানওয়ানি তাঁর গৃহেই আমাকে আশ্রয় দিলেন। বললেন, দু'-চার দিন থাকার জন্যে। দাদার খোঁজে তিনি লক্ষ্ণৌ এবং গয়াতে লোক পাঠিয়েছেন। তার ফিরে আসার সময় হয়েছে। আশা করছেন তিনি সঠিক খবর পাবেন। খবর না পেলে তবে থানা পুলিশে অনুসন্ধান করবেন। তার আগে অযথা ঝঞ্ঝাট বাধাতে চান না।

তাঁর কথা শুনে আনন্দ পেলাম।

আমাদের বাড়ির অবস্থা শুনে মনি অর্ডার যোগে বাবাকে তক্ষুনি কিছু টাকা পাঠাবারও ব্যবস্থা করলেন।

বিদেশে এমন আত্মীয়তা লাভের আশা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

দাদারে পানওয়ানি পরিবারে আশ্রয় লাভ করলাম। দেখলাম, দাদার প্রতি এ পরিবারের সকলের অগাধ বিশ্বাস, 'মণি কভু ঝুটা হোনে নেহি সকতা!'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাদার হল কি? একটা লোক জলজ্যান্ত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে? মৃত্যু হলে এতদিনে সে খবর নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়ে যেত।

পানওয়ানির দোকান থেকে নিয়ে যাওয়া সব শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ পীস প্রভৃতি সবই কী বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে দাদা উধাও হয়ে গেছে? বড় বিস্ময় এবং রহস্যের ব্যাপার এ যে!

যাই হোক, কিছুদিন এখানে থাকা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর কিছু নেই। দাদার একটা খবর না নিয়ে কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে পারছিনে। আর কলকাতায় গিয়েই বা কী করব? সেই তো উপহাসের জীবন। তার চেয়ে এখানে কী কোন কাজকর্মের যোগাড় করা যায় না? পানওয়ানি সাহেবকে এ বিষয়ে বললে কেমন হয়?

৫

॥ মণিমোহনের কথা ॥

মণি তো এক মূল্যবান রত্ন। বাবা-মা তাঁদের একটিমাত্র ছেলের নামকরণ করেছিলেন সেই মহার্ঘ রত্নের কথাই ভেবে। ছেলের নাম মণি আর মেয়ের নাম পান্না। কিন্তু নামের মর্যাদা রাখতে পারলাম কই? গরিব বাপ-মায়ের ছেলে উপযুক্ত লেখা পড়া শিখতে পারলাম না। অবিশ্যি সে দোষ আমার সম্পূর্ণ নিজের নয়। আমি তো আর লেখাপড়ায় অবহেলা করিনি। তা করিনি বটে, কিন্তু তেমন-ভাবে লেখাপড়া করলে আমার আজ তো পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে শাড়ি কাপড়ের দোকানের দালালি করে জীবন যাপন করতে হত না।

আমি যদি পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করে সরকারি বৃত্তি লাভ করতাম, তাহলে কী আর বাবা লেখা পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিদেশ-বিভূঁইতে কাপড়ের দোকানে সেলস্‌ম্যানগিরির কাজে পাঠিয়ে দিতেন?

অবিশ্যি আমাদের সংসারের যা অবস্থা তাতে এ ছাড়া আর গত্যন্তরই বা কী ছিল? তবুও যদি ভালো ছেলের দলে আমার নাম থাকত তাহলে কলকাতার সব কলেজ থেকেই আমার ডাক আসত। বাবাও বুঝতেন যে করে হোক ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ওকে লেখাপড়ায় এগিয়ে চলতে দেওয়াই উচিত।

তা তো আর হয়নি। সেকেণ্ড ডিভিসনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছি। সে তো আমার ছোট বোন পান্নাও করেছে। আমার মতন হায়ার সেকেণ্ড ডিভিসন হয়নি। নিচে স্থান পেয়েছে। তবুও সেকেণ্ড ডিভিসন। কর্মক্ষেত্রে আমিও যা পান্নাও তাই।

আচ্ছা, সংসারের তাগিদে না হয় লেখাপড়া আর করতে পারলাম না। বম্বেতে চলে এলাম কাপড়ের আড়তে চাকরি নিয়ে। কিন্তু সে চাকরিতে সন্তুষ্ট থেকেও তো নিজে ব্যবসা পত্তরের কাজ ভালোভাবে

শিখে নিতে পারতাম। সৎপথে থেকে অর্থোপার্জনও করতে পারতাম। তা করলাম না কেন? হঠাৎ লাফিয়ে উঁচুতে উঠতে গেলাম কেন? সৎ ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে হয়ে অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করতে প্রয়াসী হলাম কেন? আমার বংশে কেউ মদ খেয়ে পতিতার প্রতি আসক্ত হয়েছে—এমন কথা তো শুনিনি। অসৎ পথে চলতে গিয়ে বাবা স্টোর কীপারের পাকা চাকরি খুইয়েছিলেন—এ তো আমার চাক্ষুষ দেখা। তবু কেন আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না? অথচ চোখের সামনেই তো দেখলাম কী আদর্শ মেয়ে ওই হীরাবতী শুক্লা।

না, আর ভাবতে পারছিনে। আজ এ কী হল আমার! এ দশা হল কী অতিরিক্ত নেশা করে আর কুলটার সঙ্গে সহবাস করে? সেখান থেকেই কী এক ভয়ঙ্কর যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এই দশা হয়েছে আমার?

না, আমার কিছুই হয়নি। বর্ষার এক ভীষণ দুর্যোগ রাতে একলা ঘরে নৈশ স্বপ্ন দেখছি! স্বপ্ন নয়—ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।

আয়নায় নিজের প্রতিকৃতিতে এতদিন ধরে দেখে এসেছি—একটি সুস্থ, সবল, সুপুরুষ যুবা আমি। সেই মানুষটির এ কী রূপান্তর?

মাথাটি অসম্ভব ভারী, দেহের তুলনায় মাথাটি অনেক বড়। পেটটা একেবারে ঢুকে গেছে পিঠের সঙ্গে এক হয়ে। আর পা দুটো সরু সরু বকের ঠ্যাং।

কী আশ্চর্য, সারা শরীর জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। নড়তে চড়তে পারছিনে কেন এখন আর? মাথাটিও তুলতে গিয়ে তুলতে পারছিনে!

পেট কুঁকড়ে গেছে। রাতের শয্যা নরম মসৃণ তো নয় এখন আর। একটা শক্ত কাঠের ডাণ্ডা পিঠে ফুটছে। বিছানার চাদরটা সারা দেহে জাপটে ধরে আছে।

আমি কী তাহলে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি? দারুণ দুঃস্বপ্ন এক।

মানুষ থেকে এক অদ্ভুত জানোয়ারের শরীরে আমি পরিবর্তিত হয়ে গেলাম।

হঠাৎ এ কী হল? চীৎকার করে উঠতে গেলাম। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না কেন।

হোটেলের এক তলার ঘরে নিঃসঙ্গ বিছানানায় শুয়ে পড়ে আছি। সুস্থ সবল মানুষ আমি। একটু বেশি মাত্রায় নেশা করে ফেলেছি আর এক পতিতা রমণীর সঙ্গ লাভ করেছি—এই যা। সে তো এর আগেও কয়েকবার করেছি। ইদানীং এই কুপ্রবৃত্তি আমার মধ্যে জেগেছে। রোজগারপাতি একটু ভালো হলেই আর লোভ সংবরণ করতে পারি নে। অসংযত হয়ে পড়ি।

না, স্বপ্ন তো নয়।

এ ঘরটা প্রকৃত পক্ষে একটা মানুষের শোওয়ার ঘর—সিঙ্গেল সীটেড রুম। ছোট বটে, একজনের পক্ষেই প্রশস্ত। কিন্তু তার চার পাশে দেওয়াল আঁটা। বিছানার সামনে একটি টেবিলে রাশিকৃত শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সায়া, ব্রেসিয়ার ছড়ানো। টেবিলে ফটো ফ্রেমে-আঁটা একটি সুন্দরী মেয়ের ছবি।

পরণে তার পাতলা রেশমি সিফন শাড়ি আর গায়ে লো-কাট ব্লাউজ। ফুটন্ত নারী যৌবনের সুডোল বুকের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। শাড়িটির কী অপরূপ বাহার—যুবতী নারী দেহের প্রতিটি রেখাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এ ছবিটি ক্যামেরার ফ্ল্যাস-লাইটে আমিই তো তুলেছিলাম—একটি বারবণিতার ফটো। শাড়িটি নাথুরাম পান-ওয়ানির দোকানের।

আমার মডেল। এই মডেল নিয়েই শাড়ি, ব্লাউজ পীস, আর ব্রার ব্যবসা করি। নানা দেশ ঘুরে ফিরে নানা বস্ত্র বিপনীতে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাস্টোমার যোগাড় করি।

ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ। রাত কত হয়েছে তাও জানা নেই। অন্ধকার কক্ষ। বাইরে প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বন্ধ

দরজা জানালা বিকীর্ণ করে বিদ্যুতের সাপের ফণা মাঝে মাঝে মাথা দোলাচ্ছে। কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়ছে।

বৃষ্টি বৃষ্টি—শুধু অবিরল বৃষ্টির শব্দ।

প্রকৃতির এই বিপর্যয়, এই বর্ষাবিধ্বস্ত রাত আমাকে আরো বিপন্ন করে তুলল। আচ্ছা, বিশ্রী স্বপ্নটাকে কী ভুলে যাওয়া যায় না?

না। তা তো পারছিনে। তবে কী স্বপ নয়? সত্যিই সমস্ত শরীর আমার বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে?

বিছানায় পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখি শরীর নাড়তে পারছিনে আর। ভারী মাথাটিকে তুলতে পারা যাচ্ছে না। সর্বাঙ্গে এক অসহ্য যন্ত্রণা। বকের ঠ্যাংয়ের মতন সরু সরু পা দুটি ঝড়ের দোলায় কাঁপছে।

'হা ভগবান, এ কী হল আমার!'

কী বিশ্রি কাজই না জীবনের পাথেয় স্বরূপ বেছে নিতে হয়েছে আমাকে! এ-দেশ, সে-দেশ, ট্রেন বাস, ট্যাক্সি, টাঙ্গা, এবং সাইকেল রিক্সায় প্রতিদিনই আমায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়। অনিয়মিত আহার আর অজানা অচেনা স্থানে শয়নে অনিদ্রা, তার ওপর মাঝে মাঝে নেশা ভান, কুলটা নারী সঙ্গ—শরীর আর কত ধকল সয়?

এই কী একটি তরুণের আশা আকাঙ্ক্ষাময় জীবনধারা?

অদ্ভুত চাকরি আমার। অফিসে বসে কলম পেষা নয়। কিংবা দোকানদারিও নয়—সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা যা করে থাকে।

আমার কাজ নারীর তনু সজ্জার আভরণ বেসাতি করা।

এ-শহর থেকে ও-শহর, এক প্রদেশ থেকে অন্য আরেক প্রদেশ। দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত শুধু ঘোরা ফেরা করা। হোটেলে খাওয়া আর হোটেলে শোওয়া। কিছু ভালো রোজগার হলে একটু আমোদ ফূর্তি, অভিজাত রেস্তোরাঁয় ভাল খাওয়া দাওয়া, মদ্য পান, নাচ গান, হৈ-হুল্লোড়—ডানলোপিলো গদিতে রাতের শয্যা, পাশে শয্যা সঙ্গিনী। আর ভালো রোজগার না হলে দড়ির

খাটিয়ায় শস্তা ঘরে থাকা। শস্তার খাবার দাবারে উদর পূর্তি করা। ভোর না হতে ঘুম থেকে উঠে আবার ট্রেন ধরা।

আবার অন্য কোন বিলাসী শহরের দিকে অভিযান! বিলাসিনী রমণীদের মনোরঞ্জনের নানা ডিজাইনের শাড়ি মেলে মেলে ধরা, দেহের রঙের সঙ্গে শাড়ির কলার ম্যাচিং, পাড়ের বাহার, স্খলিত যৌবনহীনা নারীস্তনকে বেসিয়ার বন্ধনে সুউন্নত করার কলা-কৌশলের নিদর্শন দেখানো—এই হচ্ছে আমার পেশা। এই পেশার মাধ্যমে উপজীবিকা অর্জন।

কিছু বিক্রি হল তো ভালো—মোটা কমিশন প্রাপ্তি। বোম্বে-ওয়ালা কাপড়ের গদির মালিক খুশি হয়ে ট্রেন ভাড়া বাবদ ফার্স্ট ক্লাশ কম্প্যার্টমেন্টের ট্র্যাভলিং এলাউন্স এবং অভিজাত হোটেলে থাকা ও খানাপিনার খরচ দেবেন। বাহাদুরী কাজের জন্য এক্স্‌গ্রেসিয়া বখশিসও মিলবে! তা না হলে একেবারে থার্ডক্লাশ ট্রিটমেন্ট।

কিন্তু এ কী হল আমার?

সারা শরীরে বিকৃতি। এখন উঠে হেঁটে কাজ কর্মের তাগিদে বের হবই বা কেমন করে?

আজকের সকালের ট্রেনেই আরেক ছোকরা সহকর্মীর বোম্বে থেকে হাওড়া স্টেশনে আমার সঙ্গে মীট করবার কথা। আমি এক মাসের ছুটি নিয়েছি। ইচ্ছে আছে এই এক মাসের মধ্যে ছোট বোন পান্নার বিয়ের কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করা ফেলব। পান্নার প্রেমিক প্রবীরকে দেখেছি। ইন্টারকাস্ট বিয়েতে বাপ মা খুবই আপত্তি করবেন প্রথম প্রথম। তা সে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক করে নেব। বোনের বিয়ের জন্যে কিছু টাকাও সঞ্চয় করেছি। আর একটা মুক্তোর নেকলেস—অবিশ্যি নকল মুক্তো এবং নকল সোনা। কিন্তু শো খুব ভালো।

আবার মাথা তুলতে গেলাম আমি। পারলাম না। পাশ-ফিরতে গেলাম, পারা গেল না। কী হল আমার! ভাবতে গেলে সবই উল্‌টে-পাল্‌টে যাচ্ছে।

কোথায় আছি আমি ?

আমি কী বিহারে হাজারিবাগ স্টেশন রোডের এক হোটেলের শস্তাদরের এক কামরায় শুয়ে নেই ?

হ্যাঁ, এই তো আমার শয্যা! আর আমি অচল অবস্থায় শুয়ে পড়ে আছি।

দরজায় একটা শব্দ শোনা গেল না ?

'কে ?'

'সকাল হয়ে গেল, এখনো উঠলি নে? বলেছিলি যে বোম্বে মেল হাওড়ায় পৌছাবার আগেই তোকে স্টেশনে যেতে হবে।'

এ যে আমার মায়ের গলা। এখানে মা এলেন কেমন করে ?

মা তাকে সকাল সকাল কলকাতার বাড়িতে ঘুম থেকে তুলে দেন। কিন্তু এ তো হাজারিবাগ স্টেশন রোডের একটি হোটেলের একতলার ঘর। এখান থেকে রেল স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা। মা এখানে এসে পৌছলেন কার সঙ্গে !

বিছানা থেকে মাথা তুলতে গেলাম। অসম্ভব ভারী মাথা। পিঠে যেন একটা উটের কুঁজ। পা দুটি সরু সরু। কোন শক্তি নেই যে বিছানা ছেড়ে উঠি। নড়তে চড়তে চেষ্টা করেও বিফল হলাম।

মুখ দিয়ে কী যেন বলতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন কথাই বলতে পারছিনে। তবে কী আমি মানুষের আকৃতি হারিয়ে ফেলেছি ?

দরজায় শব্দ এবার আরো স্পষ্ট, আরো জোরালো।

'দাদা, দাদা, এই দাদা। উঠবিনে? সকাল যে বয়ে চলে গেল। ঘরের মধ্যে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এখনো ঘুমোচ্ছিস কি করে ?'

'আরে!' এ যে আমার ছোট বোন পান্নার গলা।

পান্না আমার বোন। আঠার উনিশ বছরের শ্যামলী মেয়ে। ভারী মিষ্টি স্বভাব। কিন্তু সংসারের দৈন্যে আর রুক্ষতায় দিন দিন মিষ্টত্ব হারিয়ে ফেলছে। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে ও তবু কলেজে

ঢুকেছিল। আমার মতন বিদেশ বিভূঁই-এ চাকরির চেষ্টায় বেরুতে হয়নি। কেননা, যতই অভাব থাক না কেন আমাদের সংসারে তবুও বাড়ির মেয়েরা বাইরের কাজ করে পয়সা রোজগার করবে তা হতে পারে না। তাতে যে হুগলি জেলার কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের আভিজাত্যের গর্ব খর্ব হবে, কৌলিন্য যাবে।

আমি কাজ করছি। যা পাই তাতে কোন রকমে কলকাতার সুরি লেনের একতলার ঘরের ভাড়াটিয়া বাসিন্দার কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তবে দিন দিন বাজার যে ভাবে চড়ছে, জিনিস পত্তর যেমন অগ্নি মূল্য হচ্ছে তাতে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তিন জন মানুষের আর দু বেলা অন্ন সংস্থান হয় না। প্রায় দিনই একাহারে কাটাতে হয়। তার ওপর অন্য কোন বাড়তি খরচ চালানো অসম্ভব। তাই পান্নাকে কলেজের পড়া ছাড়তে হল।

বাবার চিঠির উত্তরে কোন প্রতিশ্রুতিই দিতে পারিনি। আগে যা রোজগার করতাম তা সবই চৈতমল লালভানি বাবাকে নিজে পাঠিয়ে দিতেন। আমার মাথা ব্যথা ছিল না। আমার হাত খরচা চৈতমল আমাকে আলাদা দিতেন। তাঁর সঙ্গে ঠিক মনিব চাকরের সম্পর্ক ছিল না। বাবার অনেক দিনের বন্ধু তিনি। বন্ধুর চোখেই তিনি দেখতেন।

শুনেছি—এমন অনেক মাস গেছে যে আমার যা ন্যায্য পাওনা বাবার অভাবের কথা পত্র মারফৎ জেনে তিনি তার থেকে বেশিই টাকাই পাঠিয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত পান্নার পড়াশুনার মাঝ পথে এমন করে কলেজ ছাড়তে হত না। অন্তত বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষাটা দিতে পারত।

এখনকার মনিব পানওয়ানির সঙ্গে সে সম্পর্ক নেই। মাস মাইনে তিনি আমার হাতেই তুলে দেন। আর আমারও নিজস্ব প্রয়োজন এখন আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। চাকরিতে ঢোকার দশ বছর পর আমি আর কচি খোকাটি নই। চোখ কান

ফুটেছে আমার। দুনিয়াকে নানা ভাবে দেখতে শিখেছি। বয়েসের দাবিও দিন দিন আমাকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে।

সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভের ঘোরাঘুরি কাজ খুবই কষ্টের। আমার সহকর্মীরা দেখি সে কষ্ট লাঘব করবার জন্যে নেশা ভান করে, আমোদ-ফুর্তিতে আসক্ত হয়ে ওঠে। এ লাইনের এই হচ্ছে জীবন ধারা। বাঁচতে গেলে এটুকু নাকি দরকার।

মদ এবং মেয়ে মানুষ—অবিশ্যি বাড়াবাড়ি কিছু নয়। বাইজী মহলে একটু গান শোনা—কখনো কখনো এখানে ওখানে হ্যাপি রাইড। তাতে খরচ আছে। সে খরচ বাঁচিয়ে সংসারে দিতে পারলে পান্নার পড়াশুনো নষ্ট হত না। তার বিয়ের জন্যে চেষ্টা চরিত্তও করতেন বাবা।

কিন্তু আমাকেও তো বাঁচতে হবে। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকতে রোজগেরে ছেলের বিয়ের কথা বাবা ভাবতেই পারেন না। হোক না ছেলের আঠাস উনতিরিশ বছর বয়েস।

বাবাকে মা বুঝি বা কখনো-সখনো বলতেন আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে—'বিদেশ-বিভুঁই-এ ছেলে থাকে। বয়স হয়েছে। নগদ পয়সার মুখ দেখছে—বিগড়াতে কতক্ষণ ?'

বাবা উড়িয়ে দেন মায়ের কথা—'কী যে বলো! পাগল নাকি। এই দারিদ্র্যের সংসারে আরো দারিদ্র্যকে শখ করে ডেকে আনা। আগে পান্নার গতি করি, তারপর ওসব কথা ভেবে দেখব।'

আমি যেমন স্বার্থপর হয়েছি—সংসারও তেমনি স্বার্থপর। এর জন্য কাকেই বা দোষ দেব।

বাবা-মায়ের সংসারজীবন দেখে অবিশ্যি বিয়ে করে ঘর-সংসার বাঁধবার শখ আমার নেই। পরের মেয়েক এনে যন্ত্রণা দেওয়া মাত্র। আর আরো দারিদ্র্যকে আহ্বান করা। তার চেয়ে এই বোহেমিয়ান জীবন অনেক ভালো। মাঝে মাঝে নেশা করা। বাইজী আসরে গান শোনা আর পতিতা নারীর সঙ্গে সহবাস—এতে ঝক্কি অনেক কম। মাঝে মাঝে মাত্রায় পরিমাণ ছাপিয়ে যায় বটে। কিন্তু

সংযম আমার চরিত্রে তবু আছে—'কাট ইয়োর কোট একর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ।'

মাসের পর মাস হিসেব করে তো এই আমিই আবার চলতে পারি। কোন রকমের ফূর্তির জন্যে টাকা খরচ করিনে। আবার উপরি পাওনা পেলে একেবারে বেহিসেবী হয়ে পড়ি। যেমন এখানে এই হাজারিবাগ রোডে আসার আগে গয়াতে চরম বেহিসেবী হয়ে পড়লাম। ফালতু কিছু রোজগার করেছিলাম—বেশ কিছু টাকা। সঞ্চিত থাকলে পান্নার বিয়েতে কাজে লাগত। পান্নার বিয়ে ঠিক করতেই অথচ এক মাসের ছুটি নিয়ে আমি কলকাতায় চলেছি। হঠাৎ বদ খেয়ালে কী যে করে বসলাম! অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল এক সন্ধ্যের ফূর্তিতে।

পান্নার কথা আবার আমার মনে হল।

সত্যিই সে মিষ্টি মেয়ে। ভারি কোমল স্বভাবের। চোখ দুটিতে মায়া মায়া ছায়া। কিন্তু রুক্ষ সংসার দুনিয়ার মরুভূমির তাপে সে ছায়ার নিবিড়তা কোথায়? ছায়ার রঙ ক্রমশঃ ধূসর হয়ে আসছে।

পান্নাকে দেখতে পাত্রপক্ষ থেকে দু' চারজন এসেছিল বটে, কিন্তু কী দেখে তারা পছন্দ করবে পাত্রীকে?

আজকের বাজারে মেয়ের বিয়ে হওয়া কী সহজ কথা? আধুনিক কালে পাত্রী পছন্দ হয় পাত্রীর যে সব গুণাবলী থাকলে পান্নার মধ্যে কোই বা আছে? কলেজী উচ্চ শিক্ষা, আধুনিকতার চাকচিক্য, রূপের সুষম জৌলুষ—কিছুই নেই পান্নার। আর সব চেয়ে মেয়ে অপছন্দের কারণ—অর্থাভাব আমাদের। কাঞ্চন কৌলিন্যের অভাব।

নিষ্কর্মা বাপ, কাপড়ের ফেরিওয়ালা ভাই। শহর কলকাতার নিচের তলার দুখানি ঘরের ভাড়াটিয়া,—কোন রকমে দৈন্যের সংসার চলে। সে বাড়ির মেয়ের জন্য পাত্র পাওয়া কী সহজ কথা? দু'চারজন পাত্র যাদের সন্ধান পাওয়া গেল তাদের অভিভাবক এবং

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং পাত্রই এসে দেখে গেছে পান্নাকে। কিন্তু দেখাই সার। তাদের আদর আপ্যায়নে জলযোগের ব্যবস্থা করতে অযথা কিছু অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে।

বাবা দুঃখ করে আমাকে চিঠি দিয়েছেন, 'পাত্রপক্ষ পান্নাকে উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া পছন্দ করে নাই। পান্নাকে লইয়া কি যে করিব। কেমন করিয়া তাহাকে পাত্রস্থ করিব তাহা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। তোমার গর্ভধারিণী মাতা এসব কিছুই বোঝেন না,—কন্যার বিবাহের জন্য আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন। তুমি খুব হিসাব করিয়া চলিবে। দিন কাল ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে।'

চিঠির শেষ ছত্রে লিখেছেন, 'তোমার লাইনে কাজ কর্ম করে তেমন কোন পাত্রের সন্ধান করিতে পার না? এখানে যাহারা সামান্য রকমের চাকুরি-বাকুরি করে তাহাদের দাবির কথা শুনিলে পেটের প্লীহা চমকায়। তুমি এখন বড় হইয়াছ, বিচার-বুদ্ধিও জাগ্রত হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতার এই নিদারুণ মন কষ্টের কথা নিশ্চয়ই বুঝিবে।'

হ্যাঁ, বাবার মনের কষ্টের কথা বুঝতে পারি বৈ কি!

ছোট বোন পান্নার মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সংসারের কাঁটা সে। আঠার উনিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে। দেহে শুষ্কতা, পরিপুষ্ট মেয়েলি গড়নও নয়। গায়ের রং আমার মতন উজ্জ্বল নয়।

যদিও পাত্রপক্ষকে বলা হয় পাত্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাও নয়। পান্নার রঙ শ্যামলী—অবশ্যই এই রঙ-এতেও তাকে সুশ্রী দেখায়। লম্বা একহারা চেহারা হলেও মেয়েদের ফিগার বলতে যা বোঝায় পান্নার তা আছে।

কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর তার টানা টানা চোখ দুটি। কখনো খুব সূক্ষ্ম করে দুটি চোখে কাজল আঁকে পান্না। একটা হলদে রঙের সিল্কের সিফন শাড়ি আমিই তাকে দিয়েছিলাম বিক্রী না হওয়া

শাড়ির মধ্যে থেকে। তার সঙ্গে সর্ট স্লিভ হাত কাটা লাল ব্লাউজ। কী সুন্দরই না দেখায় পান্নাকে সেই সাজ পোশাকে। কত দিন আগে এই শাড়িখানি আর ব্লাউজটি তাকে দিয়েছিলাম সে তা সযত্নে রেখে দিয়েছে এখনো অবধি। দামী শাড়ি ব্লাউজ আর তাকে দিতে পারিনি ইদানীং। নিতান্তই ঘরোয়া কাপড় জামা দিয়েছি। কিন্তু পান্নার কোন অভিযোগ নেই তার জন্যে।

আমিই বরং তার বেশভূষা দেখে লজ্জা পেয়েছি। নিজেকে এর জন্যে অপরাধীও বোধ করেছি। ইচ্ছে করলে দু'চারখানা ভালো দামী শাড়ি সায়া ব্লাউজ কী দিতে পারি নে তাকে ?

গত বছর যখন কলকাতায় এসেছিলাম তখন তাকে আশ্বাস দিয়েছি—'দাঁড়া না, বোম্বের মার্কেটটা ভালো করে বুঝে নিই আগে। তারপর ইণ্ডিপেণ্ডেটলি বিজনেস করব। তখন কত ডিজাইনের শাড়ি পরতে চাস দেখব একবার! আর তোর বিয়েতে একটা শাড়ির শো-কেসই দেবো। তা দেখে তোর শ্বশুরবাড়ির সব লোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। আর আত্মীয়-স্বজন কুটস্থ মহলের লোকজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়ার পাঁচজন তা দেখে বলবে, হ্যাঁ শাড়ি দিয়েছে বটে!'

পান্না চোখ মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিল—'আকাশ-কুসুম স্বপ্ন তুইই দেখ বসে বসে দাদা, আমি চললাম—রান্নার কাজে এখন আমাকে হেঁসেলে ঢুকতে হবে।'

একটা বিবর্ণ রং-এর মাদ্রাজী শাড়ি পরে মুখ বেঁকিয়ে পান্না রান্না ঘরে ঢুকেছিল। আমি তার গন্তব্য পথের দিকে তাকিয়ে ফের বলেছিলাম—'ভাবছিস বাজে কথা বলছি! তা নয় নয় রে নয়। দেখবি এমন ঘরে বিয়ে দেব তোর, যেখানে তুই সেজেগুজে পাটরাণী হয়ে বসে থাকবি। হেঁসেল মুখো হতে হবে না কোনদিনই।'

পান্না আমার এ কথার আর কোন জবাব দেয়নি।

বাবার বর্ণিত চিঠিতে যে দু'চারজন পাত্রপক্ষের পরিচয় পেয়েছিলাম তারা ছাড়া আর কেউ পরে আর পান্নাকে দেখতে আসেনি।

মা তার জন্যে গজগজ করতেন। বাবা নির্বিকার। আর

আমিই বা কদিন বাড়িতে আসি আর থাকি? এসব ঝুটঝামেলা সইত পারিনে আজকাল।

মাসে মাসে সংসার খরচের নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা পাঠানো ছাড়া আর কোন ভাবনার বোঝা আমার ঘাড়ে নেই। থাকলেও আমি তা বহন করতে রাজি নই। তবে মাস কাবারের টাকাটা ঠিক মতন পাঠাতে না পারলে কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে যে মাসে কিছু কম পাঠাই—তা নিয়ে সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে।

সে ক্ষেত্রে মা কিন্তু আমার পক্ষ নেন, 'আহা যা কষ্ট করে রোজগার—তাতে সব মাসই যে সমান টাকা দেওয়া যায় না এটা বোঝা দরকার আমাদের।'

বাবা খেঁকিয়ে ওঠেন, 'আমি তা হলে সংসার চালাব কেমন করে? কী দিনকাল পড়েছে বোঝ না?'

আমি ক'দিনের জন্যে গতবার বাড়ি গিয়েছিলাম। বছরে একবারই মাত্র বাড়ি ফেরা হয়। মা চেষ্টা করেন যে ক'দিন আমি বাড়ি থাকি সে ক'দিন অন্তত সংসারের দৈন্যকে ঢেকে রাখা যাক। আমার প্রতি মায়ের সহানুভূতি খুবই, 'আহা, আঠার উনিশ বছর বয়েস থেকে যে ছেলে বাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে কাজকর্ম করে বাপের সংসার চালাচ্ছে তাকে দু'দিন বাড়িতে আনন্দে থাকতে দাও। তা নয়, অভাব আর অভাব।'

গতবারে সংসার খরচ বাদে বাবাকে কিছু কম টাকা দিয়েছিলাম, আর যাই কোথায়? বাবা হিসেব চাইলেন, কত মাইনে পাই আর কত খরচ করি নিজের জন্যে।

যতই সাবালক হইনে কেন এখনো বাবার মুখের ওপর কথা বলতে শিখিনি। আমতা আমতা করে বলি,—'অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম। ঘুরে ফিরে জ্বর, হাই টেম্পারেচার, জ্বর একবার ছাড়ে আবার দু'চারদিন পরে তেড়ে ফুড়ে আসে।'

মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন,—'এখন একেবারে সেরে গেছে তো?'

বলি,—'হ্যাঁ, সহজে কী ছাড়ে। ব্লাড পরীক্ষা করে রাজসূয় চিকিৎসা করানোর পর তবে জ্বরকে কবজা করা গেছে। ম্যালেরিয়া জ্বর কিনা। ভারি পাজী রোগ। তাই অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে।'

আমার কথা শুনে বাবা বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—'কী বললি, ম্যালেরিয়া? ম্যালেরিয়া তো আমাদের দেশের রোগ। আগে ছিল দেখেছি আমাদের হুগলি জেলার দেশে গ্রামে। কলকাতায় ছিল না। ম্যালেরিয়ার জন্যেই আমার বাবা দেশের অত বড় বাড়ি ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখন আর গ্রামেও সে ম্যালেরিয়া নেই। বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশে আবার ম্যালেরিয়া কোথায়?'

মিথ্যে কথা বলেছিলাম। মাইনের টাকায় নিজের জন্যে কি কি বাবদে খরচ করি সেকথা বাবাকে মুখ খুলে বলা যায় না। তাই ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা বলেছিলাম।

বাবার কথায় জবাব দিলাম,—'আজকাল ম্যালেরিয়া জ্বর হচ্ছে ওসব দেশে খুব। অন্য কোন অসুখের কথা মনে আসেনি। অন্য সব রোগের সিমটমস্‌ও ঠিক ঠিক জানিনে, তাই ম্যালেরিয়ার কথাই বলেছিলাম। আসলে আজকাল যে মাঝে মাঝে মদ খাই, পণ্ডিতার সঙ্গ লাভ করি, বাইজীর গান শুনি—আর তার খরচ বড় কম নয়। কিন্তু সে কথা কী করে বলা যায়? আর জীবনে এ-সব না থাকলে বাঁচব কী নিয়ে?

বাবা চুপ করে রইলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, গয়ায় গিয়েছিলি এবার?'

'না। পরের বারে আসবার সময় গয়া থেকে তোমার জন্যে বালাখানার তামাক আনব।'

আমার কথা শুনে মা বাবাকে খেঁকিয়ে উঠলেন,—'এক পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই যার তার আবার ছেলেকে গয়া থেকে সুগন্ধী তামাক আনার ফরমাশ দেওয়া! লজ্জাও করে না।'

না। লজ্জা করেনি তো বাবার। লজ্জার কোন চিহ্নই দেখিনি তাঁর চোখে-মুখে। আর করবেই বা কেন? বাপের প্রতি এতো ছেলের কর্তব্য। ছেলে বড় হলে বাপ রিটায়ার করে। সংসারের সকল দায়িত্ব তখন উপযুক্ত ছেলের। আমার সেই কবেকার দেওয়া হলদে রেশমী সিল্কের শাড়ি আর লাল ব্লাউজে সাজ-সজ্জা করে, চোখে ভ্রূতে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা টেনে, মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গীর রাজপথে মেট্রো সিনেমা থেকে এ্যাডাল্টের জন্যে চিহ্নিত বিলিতি ছবি দেখে একদিন সন্ধ্যেবেলা ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছিলাম পান্নাকে। তার পাশের উপস্থিত সঙ্গী ছেলেটিকে আমি চিনিনে। তাকেও এর আগে কোনদিন চোখেও দেখিনি, কিংবা কোন সূত্রে তার পরিচয়ও শুনিনি। দেখতে শুনতে ছেলেটি মন্দ নয়। আর রাস্তায় পান্নার সঙ্গে সে বেহায়াপনাও করছিল না। দেখে খুশিই হয়েছিলাম—যদি পান্না এইভাবেই নিজের রাস্তা তৈরী করে নিতে পারে, নিক না কেন!

মা-বাবা এ খবর জানেন না। পান্নারও অভিসার-যাত্রার খবর ভাগ্যিস্ তাঁরা রাখেন না, তাহলে তাঁরা তুলকালাম করতেন। মেয়ের এ স্বেচ্ছাচারিতাকে কঠিন শাসনে প্রতিরোধ করতেন।

কোন ছেলে, কী তার পরিচয়, জাত কুলই বা কী, কাজকর্ম কী করে, স্বভাব-চরিত্র কেমন,—অনেক কথাই ভেবে দেখবার আছে অবিশ্যি। আর আজকাল শহুরে ছেলেমেয়েদের চরিত্রে ক'জনের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা? পান্না সরল মেয়ে, বাঁকা দুনিয়ার কোন খবরই রাখে না। ঠকতে কতক্ষণ?

এসব কথা যে আমার মনে হয়নি এমন নয়। তবু আমরা যখন তার ভবিষ্যতের জন্যে কিছু করতে পারছিনে তখন তার জীবন-পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবই বা কেন?

নিজের সম্বন্ধে যখন মাঝে মধ্যে ভাবি তখন বিবেকের দংশন জ্বালা অনুভব করি। দারিদ্র্যক্লিষ্ট একটি সংসারের পুরো দায়িত্ব যার মাথায় তার পক্ষে দু'পয়সা হাতে পেয়ে মদ আর মেয়েমানুষে জীবনের

সম্ভোগ-সুখে মেতে ওঠা চরম নীতিহীনতা। কিন্তু আমিই বা বাঁচি কী নিয়ে? মানুষ তো আর ভগবান নয়। সুনীতি কথাটি শুনতে ভালো। সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া মানুষের জীবনের কল্যাণ-ধর্ম। এ সবই বুঝি। কিন্তু জীবন যখন দেহের খিদেয় কাঁদে? প্রলোভন যখন হাতছানি দিয়ে ডাকে?

বন্ধ দরজাটায় এবারের ধাক্কা যেন আরো বেশি জোরের।

স্পষ্টই শুনতে পেলাম,—'কীরে আর কতক্ষণ ঘুমোবি? বোম্বে মেল ধরবি কী করে?'

বোম্বে মেইলের কথায় সত্যি সজাগ হয়ে উঠি। তবে কী আমি এখন সত্যি সত্যি মধ্য কলকাতার সুরি লেনের লোনা ধরা অন্ধকার ছোট একখানা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি?

না, তা তো নয়।

এই তো আমি এখানে। বিহারের হাজারিবাগ রোডের একটা হোটেলের সিঙ্গেল সীটেড রুমের বিছানায় শুয়ে। অন্ধকার রাত। বাইরে ঝড় জল। শুয়ে শুয়ে মেঘের গর্জন আর বর্ষণের শব্দ শুনছি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! তার অগ্নিশিখা ঘরের মধ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

বিছানা থেকে আবার পাশ ফিরতে যাই। বালিশ থেকে মাথা তুলতে চেষ্টা করি। পারছিনে, পারছিনে কিছুতেই। চীৎকার করে লোকজন ডাকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। সমস্ত শরীর অবশ আমার। কণ্ঠ বাকরুদ্ধ।

বোম্বাই শহরে পার্সি বাগানে চৈতমলের কাপড়ের গদি থেকে এখন দাদারে কাজ করছি পানওয়ানি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে। সারা দোকান ঘর—শুধু দোকান ঘর কেন পানওয়ানি সাহেবের সমস্ত বাড়ি জুড়ে শুধু শাড়ি আর শাড়ির মেলা। প্রকাশ্যে শাড়ি বেচাকেনার অর্থের লেনদেন। অপ্রকাশ্যে আরেক বিজনেস। হীরে, পান্না, মুক্তোর গোপন কালোবাজারি খেলা। এক একটা রত্ন জলজ্বল করে শাড়ির

ভাঁজে ভাঁজে। আর তার খরিদ্দার বেশির ভাগই এমন এক সম্প্রদায় যাদের বাইরে থেকে চিনবার বোঝবার উপায় নেই।

দাদার বাজারে কাপড়ের গদির মালিক সিন্ধি সম্প্রদায়ভুক্ত নাথুরাম পানওয়ানি শাড়ি বেচবার জন্যেই আমাকে নিযুক্ত করে-ছিলেন। 'চৈতরাম ফার্মে' যখন কাজ করতাম তখন থেকে পানওয়ানি সাহেব আমার পরিচয় জেনেছিলেন—ভারতের নানা প্রদেশ বোম্বে প্রিন্ট, সিনথেটিক এবং রেশমি শাড়ি বেচায় আমি বেশ অভিজ্ঞ সুচতুর এবং দক্ষ সেলস্ম্যান। আমি সৎ ছেলে।

সেই কারণে চৈতরামের দোকান উঠে গেলে পানওয়ানি সাহেব আমায় বিনা দ্বিধায় তাঁর প্রতিষ্ঠানে সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভের কাজে নিযুক্ত করলেন আরো বেশি মাইনে দিয়ে। এখানেও বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছি। কিন্তু জীবনের দাবি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর সে দাবি মেটাতে আরো টাকার দরকার।

বোম্বে, গুজরাট, সুরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত শাড়ির বাণ্ডিল নিয়ে ঘোরাফেরা করি—শাড়িমার্কেট যাচাই করতে এবার বিহারে আসা। কিন্তু শুধু শাড়ি, ব্লাউজ পীস, সায়া, পেটিকোট আর নানা ডিজাইনের ব্রা বেচে ক'পয়সাই বা পাওয়া যায়। সীমিত রোজগার।

পানওয়ানি সাহেবই হদিশ দিলেন একদিন আর এক রোজগারের পথের।

বললেন,—'জীবনে সত্যিই উঠতে চাও?'

জীবনে কেই বা আর পড়ে থাকতে চায়? তাছাড়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এই সিন্ধি সম্প্রদায়কে দেখছি বেশ কয়েক বছর ধরে। কত রকমেরই না ব্যবসা এদের। মূলের সঙ্গে আরো কত শাখা প্রশাখা। শাখা-প্রশাখাগুলি পল্লবিত হয়ে ফুলে ফলে ভরে দেয় গাছকে।

পানওয়ানি সাহেবকে বললাম—'শাড়ি বেচা ছাড়া আর কী কাজ করে উপরি কিছু রোজগার করতে পারি?'

আমার কথা শুনে সিদ্ধি শেঠ পানওয়ালি একদিন জানালেন আরেক বিজনেসের কথা। কিন্তু সাবধান করে দিলেন সেই সঙ্গে—'হুঁসিয়ার বেটা!'

সেই বিজনেসে হাতে খড়ি হয়ে গেছে আমার। কিছু কিছু রোজগারপাতিও করছি আজ বছর দুয়েক ধরে। আর এই কাজেই মদ মেয়ে মানুষে আসক্ত হয়ে উঠেছি।

গতবার যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম পান্নাকে একদিন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম—'আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। নতুন বিজনেসটা ভালো করে বুঝে পড়ে নিতে দে, তারপর দেখবি আমি নিজেই নিজস্ব কারবার করে ফেঁপে উঠব। তখন দেখবি সুরি লেনের এই একতলার অন্ধকার ছোট দু'খানা ঘর নয়। বোম্বেতে জুহু বীচের কাছে ওপরতলায় দু'খানা ফ্ল্যাট—সাজানো গুছোনো। একখানা মা-বাবার জন্মে, আর একখানা আমার নিজস্ব। সামনে শুধু সমুদ্রের ঢেউ, নীল জল আর সাদা সাদা ফেনা।'

কাজল উঠে যাওয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করে পান্না বলেছিল—'আর আমার জন্মে?'

'তুই কলকাতার মেয়ে, বোম্বেতে তোর ভালো লাগবে কেন?'

'বারে, তা বলে আমি চিরদিনই কলকাতার অন্ধ গলির অন্ধকার একতলার ঘরে পড়ে থাকব?'

'তা কেন? তোকে লেক গার্ডেন্সের আলো বাতাসওয়ালা বাড়িতে বড় লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে দেব। স্বামীর মোটরে চড়ে দামী দামী শাড়ি ব্লাউজের বাহারে ঘুরে ফিরে বেড়াবি। বাবুর্চির হাতের রান্না মাংস পোলাও খাবি আর ঝুল বারন্দো থেকে লেকের কালো জল দেখবি,—কখনো কখনো রোয়িংও করবি। আর বছরে এক আধবার বোম্বে যাবি। জুহু বীচের ওপরতলায় দু'খানি ফ্ল্যাটের মধ্যে যেটিতে খুশি এক আধ মাস থাকবি।

পান্না বাঁকা হাসি হেসে বলে—'না ভাই, তোর স্বপ্ন তোর দু'চোখ জুড়েই থাক্। গরিব হোক—ভদ্র গেরস্ত ঘরেই আমার বিয়ে দিয়ে

দে। বাবাব শবীরের যা অবস্থা আর সংসারের যে ছিরি দিন দিন হয়ে আসছে তাতে এখন আমার যা হোক্ একটা কোথাও গতি হওয়ারই দরকার। তবে দেখিস্ ছেলেটা যেন একটু শিক্ষিত এবং সভ্য ভব্য হয়।'

শিক্ষিত আর সভ্য ভব্য ভদ্র ছেলে,—যা হোক্ একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি করে, মাথা গোঁজার জন্যে অন্তত ভদ্র পল্লীতে নিচের তলাতেও বসবাসের ব্যবস্থা আছে এমন ছেলে পাওয়া যায় কোথায়? তেমন ছেলে কোথায় পাওয়া যায় বিত্তহীন বাপের সাধারণ চেহারার হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করা আইবুড়ো মেয়ের জন্যে? শাড়ির ক্যানভাসার ভাইয়ের সামান্য রোজগারে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংস্থান কোন মতে হতে পারে, একখানা সিল্কের সিফন হলদে শাড়ি কিংবা জংলা বোম্বে প্রিন্ট কখনো-সখনো উপঢৌকন হিসাবে মিলতে পারে, তার বেশি যে আর কিছুই সম্ভবপর নয় পান্না তা জানে। আর জানে বলেই তার যৎসামান্য দাবি—'গরিবের ঘর হয় হোক্ ছেলেটি যেন একটু শিক্ষিত আর ভদ্রগোছের হয়।'

কিন্তু পান্না কী জানে না এরকম পাত্র জোটানোও আজকের বাজারে কী কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ। এই কোয়ালিফিকেশনের ছেলের বাজার দর কত! নগদ বরপণ অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা, তার সঙ্গে ঘড়ি, আংটি, সাইকেল, রেডিও, কিছু ফার্ণিচার যেমন খাট, শয্যা আর কনের জন্যে যৎসামান্য গয়না হিসেবেও কিছু না হোক অন্তত আট হাজার টাকা, তারপর আছে বরযাত্রী কনে যাত্রী আত্মীয় কুটুমদের খাওয়ানোর খরচ—খুব কমসম হলেও সর্বসাকুল্যে কুড়ি হাজার টাকা বিয়ের খরচ। এই কুড়ি হাজার টাকার সংস্থান কোত্থেকে হবে? একথা না ভেবে চিন্তেই পান্নাকে এমন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের স্বপ্ন দেখালাম কেন?

ঘরের বন্ধ দরজাটি এবার সত্যি সত্যিই আরো জোরে নড়ে উঠল। ঝনঝন শব্দ। বাইরে থেকে দরজায় লাথির পর লাথি পড়ছে। আর একজনের লাথি নয়। বেশ কয়েকজনের জোরালো

পদাঘাত। বন্ধ দরজাটি কী এবার ভেঙে পড়বে ?

শরীরের সমস্ত শক্তিকে সঞ্চার করে এবার আবার মাথা তুলতে গেলাম। মাথা তোলা গেল না। স্ক্রু দিয়ে যেন বিছানার বালিশের সঙ্গে মাথাটি আঁটা। অসহ্য ভারী এক পাথর। নাড়তে চাড়তে পারিনে।

চীৎকার করে ফের কথা বলতে গেলাম,—'ওগো শুনছ। দরজা ভেঙেই তোমরা ঘরে ঢুকে আমাকে উদ্ধার কর। অহল্যার মতন আমিও যে পাথর হয়ে গেছি।'

স্বর আটকে গেল। একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হল না আমার।

বাইরে একটানা ঝড় বয়ে চলেছে। সাইক্লোনিক ওয়েদার নিশ্চয়ই।

বাইরে ট্যুরে করতে গেলে যেখানে সেখানে হোটেলে পান্থশালায় রাত কাটাতে হয়। নিরাপত্তার জন্যে ঘরের ভেতরের এবং বাইরের দরজার জন্যে নিজস্ব তালা চাবিও সঙ্গে রাখতে হয়। আমার কাছে সে চাবি অবিশ্যি আছে। আর রাত্তিরে শোওয়ার সময় নিজের হাতেই ঘরের ভেতরের দরজায় নিজস্ব তালা লাগিয়েছি। চাবিটাও আমার বালিশের তলাতেই আছে।

আজ স্যুটকেসের মধ্যে আমার অনেক টাকা রয়েছে। পরশু সকালে হাওড়া স্টেশনে পানওয়ানির লোক আসবে হিসেব-পত্তর বুঝে পড়ে নিতে।

একটু বেশি রাতেই এই হোটেলে ফিরলাম। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় বৃষ্টি নামেনি।

খানা-পিনা একটু বেশিমাত্রায় হয়েছিল। লোভ সামলাতে পারিনি। আর শয্যাসঙ্গিনী মেয়ে মানুষটি বেশি করেই মদ খাইয়েছিল আমাকে। মেয়েমানুষের সঙ্গে ফূর্তি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মদ খাই; কিন্তু বেহেট হয়ে পড়িনে কোনদিনই। এবার কেন যে

হলাম! সেই অবস্থায় ট্যাক্সি নিয়ে এই হোটেলে ঢুকেই ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে শুয়ে পড়েছি।

বোম্বে থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদ। এলাহাবাদ থেকে গয়া। গয়া থেকে হাজারিবাগ রোডের স্টেশনের কাছে এই হোটেল —একরাত্তির এখানে কাটিয়ে সকালে হাজারিবাগে একটা কাজ সেরে কলকাতায় ফিরব। এই হচ্ছে প্রোগ্রাম। কিন্তু সবই আপসেট হয়ে গেল।

বাইরে দুর্যোগভরা রাত। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত। শোঁ শোঁ করে সাইক্লোনের শব্দ হচ্ছে। বন্ধ দরজা-জানলাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিহারের হাজারিবাগ রোডের একটা হোটেলের সিঙ্গেল সীটেড রুমে শুয়ে পড়ে আছি—আমি মণিমোহন মুখার্জী। কলকাতা সুরি লেনে আমার বাপ, মা, বোন।

গয়া থেকে মোটর যোগে এখানে ফিরছি আজ রাত্তিরেই। গয়াতে বেশ ভালো কাজ হয়েছে। শুধু শাড়ি ব্লাউজ পীস আর ব্রা নয়, আরেক বিজনেস। জীবনে ওপরতলায় ওঠার একধাপ পেরুলাম এবার। সাক্সেস্‌ফুল। নকল মুক্তো আসল মুক্তো বলে বিক্রি করেছি লক্ষ্ণৌ-এর এক বাইজীকে। বাইজী কেন যে হল সে তা আমি জানিনে। সে আমার সামনে না এলেও কাজরি নাচ-গানের আসরে তাকে দেখেই আমি চিনেছি—সে আমার পুরানো মনিব স্বর্গত চৈতমল লালভানির সেই আদুরে মেয়ে লালিমা। যে মেয়ে কন্‌ভেন্টে পড়ত, বিলেত ফেরৎ ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের অত ঘটা করে বিয়ে হল, যে মেয়ে আবার স্বামী পরিত্যাগ করে আরো ধনী এক এয়ার পাইলটকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করল—সে মেয়ে বাইজী হতে গেল কেন?

নাচ-গানের আসর থেকে তার আস্তানায় ধাওয়া করেছিলাম সেই রাত্তিরেই। তারই দলের এক নর্তকীর সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল। সেই নর্তকীর কাছে লালিমার খবর শুনেছিলাম—বড় কড়া মেয়ে-মানুষ। কারুর সঙ্গে ছিনালিপনা করেনা। আর বোম্বে ফিরে

কী দারুণ কদর এখন ওর। ফিল্মে যাওয়ার আগে এই দল গড়েছিল। দলের ছেলে-মেয়েদের জন্যেই দলকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর দলের জন্যেই নাচ-গানের আসরে লালিমা যোগদান করে।

লালিমা আশ্রয় নিয়েছিল হোটেলের স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে। খুব খানদানি ব্যাপার। সেখানে কারুরই প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু আমি দেখা করি কী করে? আমার যে দেখা করা একান্তই দরকার। সে আমার প্রভুকন্যা। আর্জি পেশ করেছিলাম লালিমার সেক্রেটারির কাছে।

লালিমা ডেকে পাঠাল। সামনে এল না।

ভিতরের ঘরে লালিমা। পাশের ড্রয়িংরুমে আমাকে বসতে দেওয়া হল। কিন্তু হায় হায়, সমস্ত পরিচয়কে অস্বীকার করে সে ভিতর থেকে বলে পাঠাল, 'আউর কিছু পুছনা হায়?'

আর কী জিগ্যেস করতে পারি। তার নাম লালিমা নয়। বোম্বাই-এর পার্সি বাগানে তাব পিত্রালয়ও নয়। এমন কী বাপের নামও যেখানে মিলছে না সেখানে বোকার মতন আর কী বক্তব্য কিংবা প্রশ্ন আমার থাকতে পাবে?

তখন হঠাৎ এক বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল।

নকল হীরে আব মুক্তোর পীস কিছু লালিমাকে দেখতে পাঠালাম যদি পছন্দ হয়।

'নক্‌লি নেহি, সচ্চা জুয়েল।'

তবু লালিমা বাইরে আসে না। ভেতর থেকেই বলে পাঠায়, 'হীরা নেহি মাংতা।'

চেয়েছিল চুনী পাথর। কিন্তু দুর্ভাগ্য চুনীপাথর আমার কাছে নেই।

অবশেষে মুক্তো। আর নকল মুক্তো আসল মুক্তোর দামেই নিল। দরদস্তুর পর্যন্ত করল না। করকরে কয়েকখানি একশো টাকার নোট পকেটে পুরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। আসল কী নকল লালিমা তা আর যাচাই করল না।

কিছু রোজগার করা গেল। এর থেকে যদি শয়েকখানেক টাকা নিয়ে এখন ফুর্তি করি তাতেই বা ক্ষতি কী?

গয়ায় আর এক খানদানি কুলটা পল্লীতে গিয়ে মনের মতন মেয়েমানুষ পছন্দ করে আমোদের স্রোতে গা ভাসালাম। প্রায় দুশো টাকা এক নিমেষেই উড়ে গেল। যাক্, তবু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আর দেহের ক্ষুধা মিটেছে তো।

সেখান থেকে রাত্রে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে এলাম।

নেশার ঘোরে তাকাতে পারছিলাম না। তবু হোটেলের রেজিস্টার-খাতায় যে নাম-ঠিকানা এবং পরিচয় দিয়েছিলাম তা যে সর্বৈব মিথ্যে তা বেশ খেয়াল ছিল। নকল কারবারে এমনি নামধামই দিতে হয় আর এ-সব ক্রিয়াকলাপ আমার রীতিমত জানা।

ঝড়ের দোলায় দরজার শব্দ নয়।

থেকে থেকে কে এবং কারা যেন এসে দরজায় করাঘাত করে যাচ্ছে।—'ওঠো, সকাল হয়ে গেছে। এখনো বিছানায় শুয়ে?'

একে একে কত কণ্ঠস্বর তো শুনলাম।

দেহ বিকৃত। রোগযন্ত্রণাও ক্রমশ বাড়ছে। কারুর ডাকেই সাড়া দিতে পারছিনে। এ কী হল আমার?

মা ডাকছেন।

হাজারিবাগ স্টেশন রোড়ের এই হোটেলে মধ্য কলকাতা শুরি লেন থেকে এই সাত সকালে এখানে এসে হাজির হলেন কেমন করে?

বাবা ডাকছেন!

তাহলে সত্যিই রাত কেটে গিয়ে এখন ভোর হয়েছে। তা না হলে রাতের ঘুম ভাঙাতে দরজায় ধাক্কা দেবেন কেন?

ছোট বোন পান্নাও ডাকছে।

পরণে সেই আমার দেওয়া সিল্কের হলদে সিফন শাড়ি, গায়ে স্লিপসর্ট লাল ব্লাউজ। চোখে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা।

এ তো কলকাতার সেই চৌরঙ্গীতে মেট্রো সিনেমার সামনের দৃশ্য। সঙ্গের সঙ্গী তরুণ যুবকটিও এখানে এসেছে নাকি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে? তবে কী পান্নাকে ছেলেটি এর মধ্যে বিয়ে করেছে? আজকালকার শহরের শিক্ষিত ছেলেরা এত সৎ? বিনা পণে গরিবের ঘাড়ের বোঝা যে পাত্রী, তাকে স্বেচ্ছায় সসম্ভ্রমে খুশি মনে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে?

আবার শুনি বাবার গলা। বাবা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আমাকে—রাত শেষ হয়ে গেছে কখন, এখনো বিছানা ছেড়ে উঠলাম না কেন? আমাকে যে হাওড়া স্টেশনে বোম্বে মেইল অ্যাটেণ্ড করতে হবে। পানওয়ানি সাহেবের লোক আসবে।

সেই বাবা। যিনি সংসারের সাতে পাঁচে এখন আর একদম নাক গলান না, তিনি কেন অস্থির হয়ে উঠছেন সাত সকালে আমাকে ঘুমোতে দেখে?

আমার যে সত্যিই বলতে ইচ্ছে করছে,—'বাবা, তোমার জন্যে সত্যিই এবার আসল গয়ার মিঠে কড়া সুগন্ধী তামাক নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও, আমার স্যুটকেস থেকে বের করে দিচ্ছি।'

আরো অবাক হয়ে শুনছি মৃত চৈতমল লালভানির কণ্ঠস্বর। আমাকে শাসন করে বলছেন,—'তোমার বাবার পুরোন বন্ধু আমি। তোমাদের বাড়ি গিয়ে যে ছেলেটিকে তুলে এনেছিলাম, আশা ছিল তাকে কাপড় কেনা-বেচার কাজ শিখিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলব। বাপের সংসারের দুঃখ কষ্ট সে মেটাবে। কিন্তু বেইমান, এ কী লোভ? এ কী বেইজ্জতের কাজ? গাড্ডা, একদম ঝুটা হো গেয়ি!'

সত্যিই, লোভে পড়ে বেইজ্জতের পথে পা বাড়িয়ে এ কী রূপান্তর ঘটল আমার! এখন 'কাঁদিতে জনম গেল!'

তাও যদি সত্যিকারের জীবনের পথে সত্যিকারের প্রেমের এবং ভালোবাসার জন্যে কাঁদতাম তাহলে তো ঝুটা হতাম না। আসল রত্ন মণির ঔজ্জ্বল্যে জ্বল জ্বল করতাম।

৬

॥ মুক্তোর কথা ॥

লক্ষ্ণৌতে ফৈজাবাদ রোডে আমার পাশের বাড়িতে যে যুবকটি শাড়ি কাপড় বেচতে এসেছিল তাকে দেখেই কেমন যেন চমকে উঠেছিলাম। সেই মুখ, সেই ধারাল দুটি চোখ, সেই হৃষ্টপুষ্ট দেহ, —লম্বা স্বাস্থ্যবান যুবক। গায়ের রং সুগৌর, মাথায় ব্যাক ব্রাশ করা সুচিক্কন কেশ। পরনে বাদামী রঙের বেল বটস্ প্যান্ট, গায়ে নীল টেরিলিনের কামিজ। চোখে গগলস্ আর হাতে অ্যাটাচি কেস। পিছনে একজন শক্ত সমর্থ লোক—মাথায় তার শাড়ি-কাপড়ের গাঁটরি।

পাশের বাড়ির বাঙালী চৌধুরী সাহেব হাইড্রো ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী-মেম সাব। তরুণী, কলকাতার মেয়ে। বছর পনের হল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বয়েস বোঝবার উপায় নেই। সব সময় সেজেগুজে ফিটফাট থাকে। কে বলবে বয়েস তার কবে তিরিশ পার হয়ে গেছে—চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। বরঞ্চ ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী সাহেবকে দেখলে বয়েস হয়েছে বলে মনে হয়।

মাথার মাঝখানে টাক পড়েছে—টুপিতে ঢাকা থাকে। দু'কানের পাশে এবং পিছনে ঘাড়ের ওপর মাথার চুলগুলিতে রূপালি রং—পাক ধরেছে চুলে। কপালের রেখাগুলিতে কুঞ্চনের দাগ। চৌধুরী সাহেবের বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী মিসেস চৌধুরীরও বাপের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতা বালিগঞ্জ এরিয়ায়। ওর মা, বোন, ভাইয়েরা মাঝে মাঝে আসেন লক্ষ্ণৌতে—দেখলেই বোঝা যায় অভিজাত সম্প্রদায়ের।

আমার সঙ্গে আলাপ আছে. আমি লালিমা কনভেন্টে পড়া মেয়ে। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্বামী ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলটের চাকরি ছেড়ে আমেরিকায়

কোথায় গিয়ে আছে যে তার কোন খোঁজ খবরই পাইনে। মোট কথা—দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেও এখন আমি সম্পর্ক রহিতা।

আমি বোম্বে ফিল্মে নাচি, গান করি—পেশায় বাইজী। নাচ-গানের দলও আমার আছে। তবে বাইজী বলতে সাধারণত যাদের আমরা চিনি—আমি সে সম্প্রদায়ভুক্ত নই। তবু আমি তো বাইজীই। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে এবং স্ত্রী ছিলাম এককালে, বর্তমানে আমার অর্থ থাকলেও সামাজিক পরিচয়ে আমি নিকৃষ্ট জন বৈ কি!

মিসেস চৌধুরীর পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী আমি। চৌধুরী সাহেব, তাঁর দুই পুত্র কন্যা এবং মিসেস চৌধুরী আমার জীবনযাত্রায় প্রতি নিয়তই প্রত্যক্ষ করেন। দেখেন, ঠিক কুলটা বাইজীর জীবন আমার নয়। আমার বাড়িতে হৈ-হট্টগোল নেই। দেহ-সন্ধানী লোক পুরুষের আগমনও ঘটে না। এমন কী চৌধুরী সাহেবের ঘরের পার্টিতে মাঝে মাঝে আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত নর-নারী মদ এবং গান-বাজনার ফুর্তি করলেও আমার আলয় একেবারেই নিরামিষ সে ক্ষেত্রে।

মিসেস চৌধুরী অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখেন। আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় এমন কি মেলা-মেশাও করেন। আমার গলায় গাওয়া ঠুংরী ভজন শুনতে আসেন। আর মাঝে মাঝে রেকর্ডের গান এবং বাজনার সঙ্গে আমার নাচও দেখেন। তিনি আমার প্রতিবেশিনী শুধু নন—আমার বান্ধবীও বটে।

শাড়ির কাপড়ের ক্যানভাসার সুপুরুষ যুবককে দেখেই চিনলাম আমি—আমাদের দোকানের সেই পুরোন লোকর মণিমোহন। আমি জানি, আমার বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়েদের এবং আমার স্বামীর দুর্বুদ্ধিতে বোম্বে পার্সি বাগানের আমাদের অমন জমকালো শাড়ির বিজনেস উঠে যায়।

আর মণিমোহণ আমাদের কার্ম ছেড়ে দাদারের বস্ত্র ব্যবসায়ী পানওয়ানি শেঠের দোকানে চাকরি নেয়। পানওয়ানি শুধু শাড়ি

কাপড়ের ব্যবসাই করে না, কালোবাজারী জুয়েলারি কাজ কারবারেও সুদক্ষ ব্যবসায়ী।

মণিমোহন কী এই ব্যবসারও সেলস্‌ম্যান? কিন্তু এ যে সাপ নিয়ে খেলা!

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

যা ভেবেছে লালিমা তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

মণিমোহন শুধু শাড়ি সায়া ব্লাউজ পীস্‌ আর ব্রা বেচতে চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে ঢোকেনি।

মিসেস চৌধুরী এলেন হাসতে হাসতে খুশিতে ডগমগ হয়ে—'লালিমা, তুমি তো ভাই আসল জহুরি, দেখ তো মুক্তোগুলো আর এই হীরে—এগুলি নকল নয় ত। বাজারের তুলনায় দাম অনেক কম।'

'কোথায় পেলে?'

'আমার বাড়িতে শাড়ি বিক্রি করতে একটি ছেলে এসেছে।'

'তা শাড়ির বদলে হীরে মুক্তো কেন?'

'এটা ওর সাইড বিজনেস্‌।'

মিসেস চৌধুরীর কথা শুনে প্রথমে ভাবলাম, কাজ কী আমার এ ব্যাপারে নাক গলানোর। ধূর্ত মণিমোহন যদি বড়লোক চৌধুরী পরিবার থেকে কিছু রোজগার করে আমি তাতে বাধা দেব কেন? কিন্তু না, তা হয় না। যে প্রতিবেশিনী আমার প্রতি এত বিশ্বস্তা তাকে অযথা ঠকাতে দেব না। আর মনিমোহনের আক্কেল হওয়া উচিত।

বললাম, 'আসল নকল জানিনে। তবে কাপড়ের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কাপড় কেনাই উচিত। হীরে জহরৎ কিনে ঠকতে যাবে কেন?'

আমার সতর্কীকরণে মিসেস চৌধুরী নকল জুয়েলস কিনে ঠকে নি। কিছু কাপড়-চোপড়ই কিনেছিল মণিমোহনের কাছ থেকে।

ভেবেছিলাম চৌধুরী বাড়ি থেকে মণি আমার বাড়িতেও আসবে। কিন্তু এল না।

এল গয়াতে।

নাচ-গানের শো শেষ করে হোটেলে ফেরার কিছুক্ষণ পরে এসে শুনলাম একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, যদি কিছু জুয়েলস কিনি তার কাছ থেকে।

দেখা করলাম না। কেন জানিনা ম্যানেজারকে নির্দেশ দিলাম তবু, 'কিয়া জুয়েল হায়, লে আও হামারা পাস। দেখলাও।'

ম্যানেজার নিয়ে এল—মুক্তো আর সেই হীরের পীস্।

'আরে ইয়ে তো ঝুটা। বিলকুল ঝুটা। চোরটা শালা রংবাজী করনে আয়া।' মনে মনে বললাম। কিন্তু তবু কেন জানিনে পুরোন সম্পর্কের জের টেনে মণিমোহনের প্রতি সদয় হলাম। সহানুভূতি জাগল ওর প্রতি। হীরে নয়। এক সেট নকল মুক্তো কিনলাম আসল মুক্তোর দাম দিয়ে।

মণিমোহনের সামনে বের হয়নি। অলক্ষ্যে সে আমার উদ্দেশ্যে সম্ভ্রম ভরে কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল।

কেন জানিনে,—নকল অলজ্বলে মুক্তোগুলির দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল এল। বাবার বিশ্বস্ত কর্মচারী আজও কী বেদনার পরশ বুলিয়ে গেল আমার মনে।

সেই সচ্চরিত্রের ছেলেটি আজ ঝুটা হয়ে গেছে।

আর আমি? কনভেন্টে পড়া উচ্চ বংশজাত সৎ পিতার পুত্রী আমি। আমি কেন আরো বেশী ঝুটা, আরো বেশি মলিন হলাম?

নকল মুক্তোর সেট বেচে আসল মুক্তোর দাম নিয়ে ঝুটা মণি কোথায় চলে গেল জানিনে। সে খবরও আমি রাখিনে। তবে একবার তার মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল—সৎ মনিবের সংস্পর্শে এসেও গরীবের ছেলে এমন সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে কেন? সৎ প্রভুর কোন প্রভাবই কী তার চরিত্রে রেখাপাত করেনি?

কিন্তু মুখোমুখি হতে পারলাম না তার।

ভয় হল যে যদি পালটা প্রশ্ন করে বসে—'ঠিক কথা। কিন্তু লালিমা দেবী, আমি যদি জিজ্ঞেস করি—এমন বাবার মেয়ে লেখাপড়া শিখে তুমিই বা কেন তোমার কুলমর্যাদাকে এমন পথের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে?'

কী জবাব দেব আমি তার এ-কথার? তাই তার সামনা-সামনি হলাম না। শুধু পুরোনো নোকরকে কিছু বখশিস করলাম। এ আমাদের বংশ-মর্যাদার আভিজাত্যের নিদর্শন। কিন্তু চোট্টা মণি তা তো জানল না। সে শুধু ভাবল, বাইজীকে খুব ঠকান ঠকিয়েছে।

মণির জন্য মেজাজটা বিগড়ে গেল আমার।

বোম্বে মেইলে মণিমোহণের কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। গয়া থেকে দলবলকে বিদায় দিয়ে একলাই চলেছিলাম কলকাতায়।

কলকাতায় একটা হিন্দী ফিল্মে নর্তকীর অভিনয়ে কনট্রাকট নিয়েছি।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটি নয় কামরা স্যুট ভাড়া করা হয়েছে। শুটিং-এর দিনও স্থির হয়ে গেছে। গয়া স্টেশনেই দুর্যোগের মুখোমুখি হলাম। দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মেঘের গুরু গম্ভীর শব্দ। অশনি সংকেত। বোম্বে মেইলের একখানি ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় ছিলাম একা।

মেইল ট্রেন ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে। বাইরে অন্ধকার। মেঘ আর বৃষ্টির ধোঁওয়ায় বাইরের কোন কিছুই দেখা যায় না। ট্রেনের জানালার সাটারগুলি বন্ধ করে দিয়েছি। কড় কড় শব্দে বাজ পড়ছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর অবিশ্রান্ত ধারায় শুধু বর্ষণই নয়—সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছে।

গয়া থেকে মেইল ট্রেন যেখানে এসে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ল সেখান থেকে অনতিদূরে হাজারিবাগ স্টেশন রোড রেলওয়ে স্টেশন।

একটা সাংঘাতিক ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেন কাৎ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বোধহয় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরে আসতে দেখি—না,

আমার কামরায় কিছু হয়নি এবং আমি অক্ষতই আছি।

কিন্তু কী ভীষণ ট্রেন এক্সিডেন্ট। টেন ডিরেলমেন্ট হয়ে কয়েকখানি কামরা মাটিতে কাৎ হয়ে পড়েছে। রেল লাইনে লোকে লোকারণ্য। রিলিফ ট্রেন এসে পড়েছে। কিছু সংখ্যক হতাহতের খবর পেলাম।

আমি কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষত আছি—শুধু থেকে থেকে এক্সিডেন্টের কথা ভেবে মাথাটি ঘুরে যাচ্ছে। ঝড় জল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাজারিবাগ রোডের স্টেশনে এলাম। ডাক্তার, স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন —'না, আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই।'

বরঞ্চ কাছাকাছি হোটেলের দোতলার এক প্রশস্ত কামেরায় দুর্যোগ ঘন রাতের শেষ প্রহরে এসে আশ্রয় নিলাম।

সকাল থেকেই হুলস্থূল ব্যাপার। হোটেলের একতলার একখানি ছোট ঘর ভেতর থেকে অর্গল বন্ধ। শুধু অর্গলবন্ধই নয়, ভিতবের দরজায় তালা আঁটা। অথচ ঘরের মধ্যে একজন পুরুষ বোডার আছেন। বয়সে তরুণ,—এক ক্যানভাসার।

রাত শেষ হয়ে সকাল হয়েছে। কোনাবদামের জল প্লাবন আর বোম্বে মেইলের ডিরেলমেন্ট সারা শহরকে জাগিয়ে তুলেছে।

মেঘ কেটে গেল। ভোর থেকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে এল। এখন আকাশে দুপুরের রোদ। সকালের সূর্যে তেজ ছিল না,—খানিকটা পাতলা মেঘের আবরণে ছিল ঢাকা। বৃষ্টি তার আগেই থেমে গেছে অবিশ্যি। তবুও মেঘভারে সূর্যের রোদে প্রখরতা নেই।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সূর্যের মুখে হাসি দেখা গেল। রোদ নরম থেকে গরম হতে লাগল।

হাজারিবাগের রেললাইন সারান হচ্ছে। ট্রেন বিপর্যয়ে ক্যাজুয়ালটির সংখ্যা খুব বেশি কিছু নয়। ড্রাইভার ট্রেনটিকে বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। মাইনর আঘাত পেয়েছিল যারা হাজারিবাগ হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাদের এর মধ্যেই ছেড়ে

দেওয়া হয়েছে। কিছু আহত যাত্রীকে রেখে দেওয়া হয়েছে। ট্রেন ও-লাইনে আজ আর আসা-যাওয়া করবে না।

আমি স্থির করেছি দু'দিন এই হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে তারপর কলকাতায় যাব। সকাল থেকেই অশোকা হোটেলে হই-চই শুরু হয়েছে।

নিচের সিঙ্গেল সীটেড রুমের বোর্ডারের কোন সাড়া শব্দ নেই কেন? কী হল লোকটার? বৃষ্টি থেমেছে। বেলাও বাড়ছে— অথচ ঘরের ভিতরের লোকটি দরজা খোলে না। ডাকলেও সাড়া শব্দ দেয় না। এ কী কুম্ভকর্ণের ঘুম রে বাবা!

না, ঘুম নয়। লোকটি নিশ্চয়ই একটা কিছু বিপদ বাধিয়েছে ঘরের মধ্যে।

দরজায় প্রথমে করাঘাত, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই।

পরে দরজায় সমবেত পদের পদাঘাত—তবুও কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

হোটেলের ম্যানেজার থেকে প্রোপাইটার এবং হোটেলের সমস্ত কর্মচারি সাথ বোর্ডাররা পর্যন্ত বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে ফেলার উপক্রম করেছে, কিন্তু কী আশ্চর্য। ঘরের মধ্যের বাসিন্দা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না কেন?

আত্মহত্যা করেছে নাকি?

পুলিশে খবর দেওয়াই দরকার। যা ব্যাপার তাতে থানা-পুলিশ ছাড়া আর গত্যন্তর কিছু নেই।

তার আগেই কে একজন ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙেই ফেলল।

আমি হই-চই হট্টগোলের শব্দে দোতলায় নিজের ঘরটিতে আর আবদ্ধ হয়ে নিজেকে নিয়ে থাকতে পারলাম না। তাই কী কখনো থাকা যায়?

নিচে একতলায় নেমে এলাম।

ভেঙে-ফেলা দরজার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট ঘরখানির ভেতর তাকাতেই ছোট স্প্রিং-এর খাটের শয্যায় চিৎ হয়ে শোওয়া দলিত ক্লিষ্ট একজন

পুরুষ মানুষের মুখের দিকেই সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ল আমার।

এ কী? কাকে দেখছি আমি? এ যে সেই আঠাশ-উনতিরিশ বছরের সুশ্রী সুঠাম যুবক,—বিকৃত দেহ এবং বিকৃত মুখে শুয়ে পড়ে আছে। গলা দিয়ে একটা গোঙানির শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হচ্ছে না।

একেই তো মাত্র দিন দুই আগে গয়াতে দেখেছি আমার হোটেলে গিয়ে হীরে মুক্তো বেচতে। আর এই যুবকই তো শাড়ি কাপড়ের ক্যানভাসার মণিমোহন মুখার্জী। আমার পিতৃবন্ধুর পুত্র। একদা আমাদের কারবারে চাকরি করত—আমাদের ভূতপূর্ব নোকর মণি।

হোটেলের ম্যানেজার এবং প্রোপ্রাইটর ব্যস্ত হয়ে পড়ল,—'কী করা যায় এখন?' হোটেল রেজিস্টারে নাম ধাম পরিচয়ের বিবৃতি অবশ্যই লেখা আছে!

নাম—জহর মুখার্জী। ধাম—২২১ মাণিকতলা মেইন রোড, কলকাতা। পেশা—জুয়েলারী বিজনেস। আগমন—লক্ষ্ণৌ থেকে। গন্তব্যস্থান—কলকাতা, নিজ আবাসে।

হোটেল ম্যানেজারের কাছ থেকে যুবকটির সামগ্রিক পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল—'কভি নেহি। বিলকুল ঝুট্টা।'

কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করে লাভ নেই এখন। আমিও তা হলে ঝুট-ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে পারি।

হোটেলের সমবেত বোর্ডারদের মধ্যে কেউ কেউ বলল,—'পুলিশে খবর দেওয়াই ভালো। পুলিশই সঠিক তথ্য উদ্ধার করবে।'

কেউবা মানবতার দোহাই পেড়ে বলল,—'না। আগে চিকিৎসার দরকার। মনে হচ্ছে স্ট্রোকের অ্যাট্যাক। প্যারালিটিক স্ট্রোক। কাছাকাছি ডাক্তার নেই এখানে?'

'ডাক্তার থাকবে না? অবশ্যই আছে। কিন্তু সাধারণ ডাক্তার রোগী দেখে ওষুধপত্তরের ও নার্সিং-এর এবং ডায়েটের যে ব্যবস্থা করবেন সে সব হেফাজত পোয়াবে কে?'

একজন বললেন—'হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে রোগীর বাড়িতে টেলিগ্রাম করে দিন।' নানা রকমের প্রস্তাব চলতে লাগল এক-তলার অসুস্থ বাক্‌শক্তি রহিত বোর্ডারকে নিয়ে।

কোনটি যুক্তিসঙ্গত এবং তা কার্যকরী করার দায়িত্ব কার ?

'কেন, হোটেল কর্তৃপক্ষের।'—এ কথায় সকলেই একবাক্যে সায় দিল।

হ্যাঁ, ন্যায়তঃ ধর্মতঃ অশোকা হোটেলের কর্তৃপক্ষেরই কাজ এটি। পুলিশে খবর দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়। পুলিশি হাঙ্গামা কী সহজ ব্যাপার ? বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা !

'আমি ওঁকে চিনি।' হঠাৎ মুখ ফসকে কথাগুলি বলে ফেললাম।

'সে কী ? উনি কী আপনাব আত্মীয় নাকি ?'

প্রথমে হিন্দিতে বলেছিলাম, 'জানপুছ আদমি।' তারপর পরিষ্কার বাংলাতে বললাম, না, আত্মীয় ঠিক নন। আবার একেবারে অনাত্মীয়ও নন। পাড়াপড়শী লোক, প্রতিবেশী আমাদের। তাই.. অনাত্মীয় বলি কেমন করে ? লক্ষ্মৌতে ফৈজাবাদ রোডের বাসিন্দা। জুয়েলারি কারবাব ওঁব। নানা জায়গা ঘুবে ফিরে নানা বস্তু বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করেন। কলকাতা মাণিকতলা অঞ্চলে ওঁর বাপ মা আর এক ছোট বোন থাকেন। উনি একলাই লক্ষ্মৌতে বসবাস করেন। আমাদের বিশেষ পরিচিত লোক। আপনারজনই বলা যায়। আর তাছাড়া উনি আমাদের নাচগান পার্টিরও একজন মেম্বার '

হোটেলের ম্যানেজার এবং প্রোপ্রাইটর যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন আমার কথা শুনে। বললেন—'তাহলে আপনিই বলুন এখন ওকে নিয়ে কী করা যায় ?'

বিপদে পড়লাম এবার আমি নিজেই। কী কুক্ষণেই যে আত্মীয়বৎ পরিচয় দিতে গেলাম ! এখন মণির সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই ঘাড়ে নিতে হয়।

আর কী আশ্চর্য ! মণি কতখানি অসৎ হয়ে পড়েছে—তাছাড়া

এমন মিথ্যে আত্মপরিচয় হোটেলের রেজিস্টারে লেখাবে কেন? নিশ্চয়ই বদ মতলব এবং পুলিশি হাঙ্গামা এড়াবার জন্যেই।

যাই হোক—নিজের কৃতকর্মের জন্যে এখন আর আফশোষ করে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে সর্বাগ্রে মণির চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই দরকার।

মণিমোহনের ভেতরে চেতনা আছে। মুখ ফুটে কী যেন জানাতে চায়। কিন্তু গোঙানি ছাড়া আর কিছুই সে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। তার বিকলাঙ্গ দেহ, মুখে চোখে বিকৃতির ভাব।

আমি ডাকলাম তার গায়ে হাত দিয়ে—'মণি! মণিবাবু! কী হয়েছে আপনার?'

আমার মুখে মণি এবং মণিবাবু সম্ভাষণ শুনে হোটেলের ম্যানেজার বিস্ময় প্রকাশ করলেন—'ওঁর নাম তো জহরলাল। মণিবাবু বলে ডাকলেন,—ব্যাপার কী?'

ম্যানেজারের প্রশ্নে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম,—'জহরলাল ওঁর পোশাকী নাম। মণিবাবু বলেই পরিচিত উনি লক্ষ্ণৌতে আমাদের মহল্লায়। আর ওঁর বাবা-মাও মণি বলেই ডাকেন ওঁকে। বাড়ির ডাক নাম শুনে যদি চৈতন্য ফিরে আসে তাই সেই নামেই ডাকছিলাম ওঁকে।'

আমার এ কথায় সকলের মনের সন্দেহ নিরসন হল।

মণিবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরদর ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

'কাছাকাছি কোন বড় ডাক্তার নেই?'

'আছেন। ক্যাপ্টেন দত্ত। যুদ্ধফিরৎ ডাক্তার। খুব নাম ডাক।'

ম্যানেজারের কথায় একজন বোর্ডার বললেন—'কিন্তু এ কেসে হাসপাতালই কী শ্রেয় নয়? ইফ এ্যানি ইমার্জেন্সি নীডস্।'

'হ্যাঁ, সেইটেই ভালো যুক্তি।' আমারো মনে হল তাই।—'এখানে কী ভালো হাসপাতাল আছে?'

ম্যানেজারই উত্তর দিলেন,—'হ্যাঁ। মডার্ন এবং ওয়েল এ্যারেঞ্জড. হাসপাতাল হচ্ছে হাজারি রোড হাসপাতাল।'

'তবে সেইখানেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ইমিডিয়েটলি। আর একটুও দেরি করা উচিত হবে না।'

আমার কথায় সকলেই সায় দিলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—'আপনিও রেডী হয়ে নিন। আপনাকেই রোগীর আত্মীয় হিসেবে হাসপাতালে আইডেনটিফাই করতে হবে।'

হাজারিবাগ স্টেশন রোড অশোকা হোটেল থেকে হাজারিবাগের হাসপাতালে মণিমোহনকে ভর্তি করানো হল।

কী আশ্চর্য! ঠিক আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। রাস্কেল মণি চরিত্রভ্রষ্ট। যৌন ব্যাধিগ্রস্ত। হাস-পাতালে তাকে ভি. ডি. ট্রিটমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে রাখা হল।

এ কলঙ্ক বুঝি আমাকেও স্পর্শ করছে। একে মেয়েছেলে আমি, তার ওপর ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত আর বাইজী নামে খ্যাত। ওঃ, কী লজ্জা। ক্ষণিকের মোহ এবং দুর্বলতায় এক গর্হিত কাজ করে ফেললাম আমি! এখন আর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। মণিমোহন আমার পিতৃবন্ধু পুত্র, আমাদের পুরোনো নোকর,—অতএব তার সমস্ত দায়িত্ব ভার আমাকেই নিতে হল। কিন্তু কী পরিচয়ে মণিমোহনকে আমি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারি? অগত্যা তাকে আমার নাচগানের পার্টির একজন কর্মচারী—এই জবান-বন্দীই দিতে হল।

বেশ স্পষ্টই দেখলাম, হোটেলের প্রোপ্রাইটার, ম্যানেজার এবং আর দুয়েকজন বোর্ডার পর্যন্ত আমার মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররাও কী মুখ টিপে হাসছে না?

দুজন স্বামীকে পরপর পরিত্যাগের যে সামাজিক লজ্জা, উচ্চবংশের নামে যে কলঙ্ক আরোপ—লালিমা থেকে মুক্তোবাই নাম গ্রহণের যে নৈতিক অধঃপতন, তার চেয়েও অনেক বেশি গ্লানিকে আজ অনুভব করতে লাগলাম।

কিন্তু এখন আর অন্য উপায়ই বা কী আছে?

অশোকা হোটেল ছেড়ে হাজারিবাগে আর একটি হোটেলে এসে উঠলাম। হাসপাতালের কাছাকাছি। সবসময় রোগীর খোঁজ-খবর রাখতে পারি। মণিমোহনের এ্যাটাচী কেস এবং অপরাপর সব ব্যবহার্য জিনিস-পত্তর নিজের জিম্মায় রাখলাম। হোটেলের পাওনাও কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিলাম।

কিন্তু একা স্ত্রীলোক হয়ে কতদিক সামলাবো আমি? মণি-মোহনের বাপ-মাকে এখুনি কলকাতায় খবর পাঠানো দরকার।

ঠিকানা? ঠিকানা কোথায় পাই? মণিমোহনের এ্যাটাচী কেস তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু না, আপনজন বলতে কোন কারোর ঠিকানা নেই এতে।

ঈশ্বর সহায়। মণিমোহনের এ্যাটাচী কেসের মধ্যে একটা নোট বইতে দাদারের পানওয়ানি সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেল। অগত্যা তাঁকে তক্ষুনি জরুরি তার পাঠালাম।

লক্ষ্ণৌতে আমার ম্যানেজারকেও খবর পাঠালাম।

কিন্তু কী আশ্চর্য, যারা ক্যানভাসিং-এর কাজ করে—এখানে ওখানে, এদেশ-সেদেশে তাদের তো প্রায়ই ঘুরতে হয়। তারা যে নিজের আইডেনফিকেশন এবং বাড়িঘরের কোন ঠিকানা নিজের সঙ্গে রাখবে না—এ কেমন কথা? অনেক খুঁজেও মণির কলকাতার বাড়ির ঠিকানার কোন হদিসই পেলাম না। সর্বাগ্রে তার বাবা মাকেই আমার খবর দেওয়া উচিত ছিল। তাঁরা এসে পড়লে অনেক কলঙ্কের হাত থেকে আমি পরিত্রাণ পেতাম। কিন্তু, কোন উপায়ই দেখলাম না।

মণিমোহনকে তো আমার দলের কর্মচারী বলে স্টেটমেণ্ট দিলাম; কিন্তু তার আসল মালিক বোম্বাইয়ের দাদার শহরে বিখ্যাত ক্লথ মার্চেণ্ট পানওয়ানি সাহেব আমার তার পেয়ে যখন স্বয়ং এখানে এসে উপস্থিত হবেন এবং মণির আসল পরিচয় যখন হাসপাতালের সকলে

জানবে তখন আমার অবস্থা কী হবে ভেবে সত্যিই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

কী করা যায় এখন? হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। আর সেই মর্মে পানওয়ানি সাহেবকে আবার তক্ষুনি তার করলাম যে তাঁর নিজের আসার দরকার নেই। তাতে হাঙ্গামা আরো বাড়বে। তিনি যেন মণির বাড়িতে যোগাযোগ করে তার বাবা মাকে এখানে পাঠিয়ে দেন।

পানওয়ানি সাহেব শুধুই যে শাড়ি কাপড় আর গারমেন্টসের বিজনেস করেন না, এ আমার জানা কথা। সিন্ধি সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়ে আমি। পানওয়ানি সাহেবকে ভালো করেই জানি শুনি। মণি যে নকল হীরে, মণি, মুক্তো বেচে, তা চোরাই কারবার এবং এ-ব্যবসা আসলে পানওয়ানি সাহেবের। অতএব পুলিশ কেসের ভয় আছে। আমার দ্বিতীয় প্রেরিত তারবার্তার আসল মর্মার্থ নিশ্চয়ই বুঝবেন ঝানু ব্যবসায়ী পানওয়ানি সাহেব। আর তিনি নিশ্চয় তখন এ হাঙ্গাম তার স্কন্ধে বহন করবেন না।

মণির জন্যে মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। এতদিন যা অনুভব করিনি, এখন যেন তা অনুভব করছি।

মণির বাবা আমার পিতৃবন্ধু। কিন্তু তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের আর কারোর সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই। কেউই তাঁরা কখনো বোম্বেতে আমাদের বাড়িতে কখনো আসেননি। মণি এসেছিল আমাদের দোকানের কর্মচারী হয়ে। আমার পিতৃবন্ধুর পুত্র হলেও সে আমাদের পরিবারে কোন মর্যাদার আসন লাভ করেনি। নিতান্তই একজন বেতনভূক কর্মচারী মাত্র। আমিও তার সঙ্গে কোনদিন অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিনি। তবে কী আজ তার এই বিপদে নিছক কর্তব্যের খাতিরেই এতখানি দায়িত্ব নিলাম? তার চারিত্রিক এই অধঃপতনে আমার এত মর্মবেদনা কেন? কেন আমি এত অর্থ খরচ করছি তার সুচিকিৎসার জন্যে? যৌন ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছে সে। প্যারালিসিস্। বাকশক্তিরহিত। এ রোগ

কী তার সারবে? চিকিৎসকরা নিশ্চয় করে তা বলতে পারছেন না। যদি না সারে তা হলে কী একটি তরুণ জীবনের এইখানেই ক্ষান্তি?

এত দুশ্চিন্তার মধ্যে একটি চিন্তা থেকে মুক্ত হলাম। দাদার থেকে পানওয়ানি শেঠজি মণির কলকাতার ঠিকানা তার যোগে পাঠিয়েছেন।

৭

॥ পান্নার কথা ॥

দাদার অন্তর্ধানের পর কত চেষ্টাই না পানওয়ানি সাহেব করেছেন তাকে খুঁজে বের করতে; কিন্তু এতদিনে তা সম্ভবপর হয়নি। দাদার কাছে অনেক টাকাই পাওনা বোম্বে দাদার বাজারের সিদ্ধি পানওয়ানি শেঠজির।

আশ্চর্যের কথা, শেঠজির তার জন্যে কোন দুর্ভাবনা নেই। চোর আর ঠক্‌বাজ কর্মচারীকে শাস্তি দেবার জন্যে তিনি থানা পুলিশও করেননি। ব্যবসায়ী চরিত্রের এ আরেক দিক। বরঞ্চ আমি যখন বাড়ির অবস্থা জানিয়ে কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম তখন তিনি আমার কাঁপা কাঁপা হাত দুটি ধরে পরম আশ্বাসের কথাই শুনিয়েছিলেন,—'রোনা মাৎ বেটি। তুম হামারা পাশ রও। কোই ডর নেহি।'

না, কোন আশঙ্কা নেই আমার এখন শেঠ পানওয়ানির আশ্রয়ে থাকার। তিনি আমাকে তাঁর দোকানে কাজ দিয়েছেন।—ঘোরাঘুরির কাজকর্ম নয়, দোকানে বসে হিসেব পত্তর রাখা শুধু।

দাদার মাইনেতেই এই কাজে রত হয়েছি আমি। বাবা মাকে চিঠিতে সব জানিয়েছি। জানিয়েছি,—দাদার খবর পাওয়া মাত্রই তাঁদের সবিস্তারে জানাব। পরম আশ্বাসের কথা, আমি চাকরি পেয়েছি। মাইনের টাকা ঠিকমত পাঠাব। তাদের কলকাতায় না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না।

'কিন্তু দাদার হল কী?' অত্যন্ত বিমর্ষভাবে সর্বক্ষণ সেই কথাই ভাবি।

শেঠজি বলেন, 'ছোকরা গাড্ডা মে গিরা। ঝুটা হো গেই।'

সংসার-অভিজ্ঞ শেঠজির কথাই ঠিক। কোন বদ সঙ্গে পড়ে টাকা কড়ি খুইয়ে দাদা নিরুদ্দেশ। তা না হলে প্রায় এক সপ্তাহ পার হতে চলল, দাদার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না কেন? বিপদ আপদে পড়লে, ঈশ্বর না করুন,—খুন জখম হলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকলেও শেঠজির বোম্বে শহরের এই দাদার পত্নীর আস্তানায় কিংবা মধ্য কলকাতায় আমাদের সুরি লেনের বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে কোন না কোন খবর এতদিনে নিশ্চয়ই এসে যেত।

তা যখন আসেনি তখন শেঠজির কথাই ঠিক।

পানওয়ানি শেঠজি আমাকে কন্যাবৎ স্নেহ করেন। তাঁর নিজের বাড়িতে আলাদা একখানি দোতলার ঘরে আমার স্থানলাভ ঘটেছে। তাঁর বিবি আমার সঙ্গে আপনজনের মতনই ব্যবহার করেন। তাঁর সংসারেই খাওয়া দাওয়া করি।

পানওয়ানি দম্পতির কন্যা সন্তান নেই, আমি যেন এই ক'দিনেই সেই স্থান অধিকার করেছি।

তাঁর দুই ছেলে। বড়টি সুরাটে কাজ কারবার করে। সে তার স্ত্রী নিয়ে সেইখানেই থাকে। ছোটটি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে—বিজ্ঞানের ছাত্র।

পানওয়ানি সাহেবকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম,—'তোমার এত বড় বাড়ি থাকতে ছেলেকে হস্টেলে রেখেছ কেন?'

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।' আপ্তবাক্য এই সংস্কৃত শব্দগুলি বণিক শিদ্ধি তাঁর কোন বাঙালী অধ্যাপক বন্ধুর মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছিলেন। আমার কথার উত্তরে এই সংস্কৃত আর্য ভাষা উচ্চারণ করে তিনি সবিশদ ব্যাখ্যাও করলেন,—'আমার এ বাড়ি ব্যবসার জায়গা। বড় গাড্ডা,—ব্যাড প্লেস। এখানে থাকলে লেখাপড়া হয় না। এখান থেকে আমার বড় ছেলে তাই লেখাপড়া শেখেনি।'

আমি বললাম, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। লেখা পড়া শিখে কী

করতেন তিনি? তার চেয়ে তো জাত ব্যবসায়ী হয়েছেন। অনেক টাকা রোজগার করেন।'

'—হ্যাঁ, তা করে বটে। তবে তাতে কী সে সত্যিকারের ইজ্জৎ লাভ করেছে? বেবোসা তো চোট্টা কা কারবার।'

পানওয়ানি শেঠের কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বলি,—'ব্যবসা মানেই কী জাল জুয়াচুরি?'

শেঠজি শুধু মৃদু হেসেছিলেন,—'তুমিও তো ব্যবসাদারের ঘরে কাজ নিয়েছ বেটি। ক'দিন থাক—সব কিছুই দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে।'

'কিন্তু লেখা-পড়া শিখে হা-চাকরি—জো চাকরি করার চেয়ে—'

আমার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শেঠজি বললেন—'মা,, ভগবানের কৃপায় এই ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক টাকা কামিয়েছি। কিন্তু বড়ো সমাজে আমার জায়গা কোথায়? কে আমাকে চেনে জানে 'বল?'

'কেন, আমি তো শুধু তোমার নাম করেই এককথায় দাদার বাজারে তোমার গদিতে এসে পৌছালাম চাচাজি। এখানে সকলেই তো তোমাকে চেনে। তোমার নাম জানে।'

পানওয়ানি আমাকে 'মাতাজি' এবং 'বেটি' বলে প্রথম থেকেই সম্ভাষণ করেন, তাই আমিও তাঁকে চাচাজি বলেই ডাকি।

আমার কথা শুনে চাচাজি বললেন,—'এ চেনা আর বৈজ্ঞানিক ভাবাজিকে চেনা অনেক তফাৎ। জমিন আউর আসমানকা ফারাক।'

পানওয়ানি শেঠের প্রত্যাশা ছোট ছেলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে আমেরিকায় যাবে রিসার্চ করতে। সেখান থেকে ডক্টরেট হয়ে এইখানেই ফিরবে। ভাবা ইনস্‌টিটিউটে বৈজ্ঞানিকের কাজ করবে।

পানওয়ানি শেঠের ছোট ছেলেটি নাকি লেখাপড়ায় বেশ চৌখস। বি-এস-সিতে ফিজিক্সে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেলেও বাপ আসমানের

চাঁদ ধরার প্রত্যাশা করেন।

দাদার বাজারে পানওয়ানি ক্লথ স্টোর্সে হরেক রকমের ব্যবসার অলিগুলির খোঁজ-খবরও পেয়েছি এর মধ্যে। অনভিজ্ঞ মেয়েছেলে হলেও কিছু কিছু বুঝি বৈকি! বিশেষ করে চাঁদি সোনা নয়,—হীরে মুক্তো চুনী পান্না জহরতের রত্নগুলি চোখের সামনে জল জল করে জ্বলে।

তবু এ সব রত্ন সম্ভার নাকি আসল হীরে মুক্তো চুনী পান্না নয়!

চাচাজি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন আমার কথার প্রতিধ্বনি তুলেই—'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। হ্যাঁ। জরুর, বিলকুল সচ্চা বাৎ। ভারতের সর্বপ্রদেশের ছেলে মেয়েরাই এ সচ্চা বাৎ-এর প্রতি আস্থা-শীল। তাই তেমন ভাবে লেখা-পড়া না শিখেও তারা স্বাধীন ভারতবর্ষের আজ আসল মালিক। বাঙলা মুলুকই শুধু সৃষ্টি ছাড়া। আজন্ম বংশ পরম্পরায় তারা শুধু নোকরি করতেই জন্মেছে। তাই নোকর হয়ে আজ তাদের এই দুরবস্থা। আগে মেয়েরা লেখাপড়া শিখত না। ঘর সংসারের কাজ করত, স্বামীর ভাত কাপড়ের দাসী হয়ে দাসীবৃত্তি করত। অবিশ্যি সব্বাই নয়। সংসারের গৃহিণী হয়ে লক্ষ্মীস্বরূপা মহিলার তা বলে অভাব ছিল না। তবুও সাধারণ নিম্নমান বাঙালী সমাজে মেয়েদের দুর্গতির আর অন্ত ছিল না। এখন স্বাধীন জমানায় বাঙালী জেনানা সেই অন্ধকারে পড়ে নেই। লেখা-পড়ায় আংরাজিতে কথাবার্তা বলায় পোক্ত হয়ে তারা আজ শুধু স্কুল কলেজে পড়ায় না, কলকারখানায় অফিস আদালতেও কাজকর্ম করে। বাঙালী পুলিশ মেয়ে আছে, মেজিসট্রেট, আউর উকিল ভি, আউর ডকতর ভি হায়—লেকিন বেবসায় মে—'

হ্যাঁ। ঠিক কথাই বলেছেন চাচাজি। কলকাতা নিউমার্কেটে সিন্ধি সপে আমি দেখেছি সিন্ধি মেয়ে মালিক হয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। শেয়ার মার্কেটে শেয়ার কেনা-বেচায় মাথা ঘামাচ্ছে। নানারকমের স্পেকুলেশনের মাধ্যমে অনেক অনেক টাকা রোজগার করে।

বড় বড় দোকানে অবিশ্যি সেলস-কাউন্টারে কলকাতার বড় বড়

বিপণিতে অনেক মেয়েদের মধ্যে বাঙালী মেয়েরাও এখন কাজকর্ম করে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে খাদি প্রতিষ্ঠানে এবং সমবায় বিপণিতে তো মেয়ে ভর্তি। কেমন সুন্দর আর যোগ্যতার সঙ্গে কাজকর্ম করে তারা। ট্রামে বাসে মেয়ে ভর্তি অফিসযাত্রী—যে কারণে লেডীস স্পেশ্যাল ট্রাম-বাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও সব মেয়েই চাচাজির ভাষায় নোকর!

বোম্বেতে আশ পাশের দোকানে দেখি সিন্ধি ব্যবসায়ী মেয়েদের। যারা দোকানের কর্মচারী নয়, দোকানের মালিক।

চাচাজি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি আমাকে মালিকানি ব্যবসায়ী করে গড়ে তুলবেন।

বোম্বাই কিংবা কলকাতা শহরে খোদ দোকানদার হব আমি। আমিই মালিক, হাজার হাজার টাকার লেন দেন। ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট। আমারই তাঁবে খাটবে কর্মচারীবৃন্দ—আমি যাদের মাস মাইনে হাতে তুলে দেব। চাকরির আর্জি নিয়ে আমার কাছেই আসবে কত বেকার যুবক-যুবতী।

কিন্তু চাচাজির প্রতিশ্রুতি সত্বেও এ আনন্দোজ্জ্বল স্বপ্নের ছবি দেখতে পাইনে আমি।

সর্বদাই দাদার দুর্ভাবনায় মন ক্লিষ্ট এবং পীড়িত থাকে। দোকানের কাজেও মন দিতে পারিনে—হিসেব নিকেশে ভুল হয়।

চাচাজি থেকে থেকে মৃদু ভৎর্সনা জানান—'এই সা ঠিক নেহি।'

আমার চোখদুটি ছলছল করে ওঠে।

চাচাজি তা দেখে সহানুভূতির সুরে বলেন,—'এ্যত্তনা চিন্তা কাহে।'

তিনি আশ্বাস দেন, দাদা তোমার ঠিকই আছে। বদ সঙ্গে পড়ে পয়সা কড়ি খুইয়ে লজ্জায় এখানে আসতে পারছে না। দু' একদিনের মধ্যেই দেখবে আসল পাত্তা মিলে যাবে।

বোম্বাই-এর দাদার বাজারের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট

পরিচয় পাওয়া গেল দু'য়েক দিনের মধ্যেই। নাথুমল পানওয়ানি সাহেবের গদিতে এক আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসে হাজির। তারের সংকেত বার্তায় জানা গেল গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মণিমোহন মুখার্জি হাজারিবাগ হাসপাতাল নীত। অচৈতন্য অবস্থায় শায়িত। 'কাম সার্প'—ওয়ার ক্যালকাটা এ্যাড্রেস।' টেলিগ্রাম প্রেরিকা এক অজ্ঞাত নারী যার নামের সঙ্গে শেঠ পানওয়ানির কোন পরিচয়ই নেই।

আর দেরি নয়! দাদা গুরুতর অসুস্থ। দু চোখ বেয়ে আমার অশ্রুর প্লাবন,—'চাচাজি, আমি এখুনি হাজারিবাগ যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবে বেটি। তুমি একলা নয়। দোকানের অপর কোন লোকজনও নয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

টেলিগ্রাম যখন এলো তখন রাত হয়ে গেছে। সেদিনের মেইল ট্রেন ধরার আর কোন উপায় নেই। পানওয়ানি চাচাজি আমার অধীরতা দেখে আশ্বাস জানালেন, 'ডরো মাৎ বেটি। যত তাড়াতাড়ি পৌছানো যায় আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

আমার রাতে আর ঘুম হলো না। দাদার জন্যে মন ছটফট করতে লাগল। এমন কী অসুখ যে দাদাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে এবং যিনি তার পাঠিয়েছেন তাঁর সঠিক কোন পরিচয়ও পানওয়ানি চাচাজি দিতে পারলেন না। তবুও মনকে দৃঢ় করতে লাগলাম। ভাবনা হল কলকাতার সুরি লেনের বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে কী খবরটা পৌছেছে? দাদা যদি কোন এ্যাকসিডেন্টে পড়ে হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় থাকে তা হলে কলকাতার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যাবে কেমন করে? স্থির করলাম, বাড়িতে একটা জরুরি তার করে দিই।

কিন্তু রাত এখন গভীর। এই রাত্তিরে কী করে টেলিগ্রাম করা যায়? আফশোষ হতে লাগল টেলিগ্রামটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেন এই বুদ্ধিটি মাথায় এলো না? অনিদ্রায় দুর্ভাবনায় সারা রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দেখলাম, পানওয়ানি চাচাজির মুখখানি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ভরা। আমার সঙ্কল্পের কথা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করলেন, 'বেটি, তোমার বাবা-মাকে এখুনি আর্জেন্ট তার পাঠাচ্ছি যাতে তাঁরা হাজারিবাগ চলে যান। আর আমার এখান থেকেও লোক যাচ্ছে।'

'আপনি যাবেন না ?'

'নেহি!'

'কেন ?'

প্রশ্ন করেই আমি পানওয়ানি শেঠজির মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখে এক আশ্চর্য ভাবান্তরের লক্ষণ।

'বহুত জরুরি কাজে আটক গেছি। আমার পক্ষে এক্ষুনি যাওয়া সম্ভবপর নয়।'

'তবে দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দিন।'

আমার কথায় পানওয়ানি চাচাজি প্রথমে আপত্তি প্রকাশ করলেন, 'আমার লোক হাজারিবাগ পৌছেই ট্রাঙ্ক কল করবে। তখন তুমি আর আমি দুজনে যাব।'

কিন্তু চাচাজির কথায় আমি কিছুতেই রাজি হতে পারলাম না। দাদার জন্যে আমার মন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম।

পানওয়ানি সাহেব অগত্যা তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর সঙ্গে আমাকে হাজারিবাগ পাঠাতে রাজি হলেন।

পানওয়ানি সাহেবের এই মত পরিবর্তনের কথা প্রথমে আমি জানতে পারিনি। চলন্ত বম্বে মেইলের কমপার্টমেন্টে চাচাজির বিশ্বস্ত কর্মচারী—যাকে দেখেছিলাম দাদার খোঁজে আমাদের কলকাতার সুরি লেনের বাড়িতে—তাঁর মুখেই শুনলাম, হাজারিবাগ থেকে দাদা সম্পর্কে প্রেরিত আরেকখানি তারের কথা।

কিন্তু সে তারে এমন কী বার্তা থাকতে পারে যাতে পানওয়ানি সাহেবকে হাজারিবাগে যাত্রার মত পরিবর্তন করতে হল ?

৮

।। চুনীলালের কথা ।।

আমার কথা বিশেষ কিছু বলবাব নেই।

যদিও সৎ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম আমার। পিতৃপুরুষ ভরদ্বাজ মুনি-বংশজাত হুগলি জেলাব মহেশপুবের বিখ্যাত কুলীনমুখুজ্জে পরিবারের সন্তান, কিন্তু সে গৌরবকে অক্ষত বাখতে পারিনি নিজেব কর্মদোষে।

আমাদের কালে উচ্চশিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। লাঙ্গল চষাব মতন পৈত্রিক কিছু ক্ষেত খামার অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে যোগ্যতাই বা কই আমার। অবশেষে বেকার ছেলে। বাপেব ভাতে খাই দাই আর গ্রামেব থিয়েটারে ফিমেল রোলে অভিনয় করে বাহবা কুড়োই।

বাবা তাতে আরো রেগে যান। মাকে তর্জন গর্জন করে বলেন,—'বাডা ভাত পাতে না দিয়ে ছাই দিতে পার না?'

বাবাব এ তিবস্কাব শুনে বিদ্রোহ কবেছিলাম।

বিদ্রোহ? হ্যাঁ, এও এক বকমের বিদ্রোহ বৈ কি? প্রতিজ্ঞা করলাম—'মহেশপুরের মুখুজ্জে বাড়ির অন্ন মুখে তুলব না।'

বাবা গ্রাম্য নাটুকে দলে আমাকে অভিনয় করতে দেখে প্রায়ই বকতেন মাকে—'কলকাতায মথুর সাহা যাত্রা দলে ছেলেকে তোমার পাঠিয়ে দাও। রাণী সেজে ছবেলা ছ'মুঠো অন্ন মুখে তুলতে পারবে।'

বাবার তিরস্কারে হতমান হযে একদিন অবশেষে যাত্রার দলে রাণী সাজবার অভিপ্রায়ে গৃহ ছাড়লাম। বয়েস তখন আমার কুড়ি বছর।

বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান আমি। জ্যৈষ্ঠত্বের মর্যাদা রাখতে পারলাম না। অথচ আমার পরের ছ'ভাই দেখতে দেখতে ম্যাট্রিক পাশ করে গেল। কলেজেও ভর্তি হল। ছোট ভাই তো শেষকালে হুগলী কোর্টের মোক্তারও হয়েছিল। জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে হুগলী

শহরে তেলেনিপাড়ায় বাড়ি ঘর করে সম্মানিত জীবনের অধিকারী হয়েছে।

অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না। না শিখলাম লেখা-পড়া, না করলাম পৈত্রিক জমি-জমা তদারকির কাজ। অভিনয় অবশ্য ভালোই করতাম। কিন্তু আমাদের কালে তখনও অভিনয় শিল্পসম্মত জীবন-বৃত্তি বলে গৃহীত হয়নি। সমাজে শিল্পের মর্যাদাও স্বীকৃত নয়। সংসারের চোখে আমি বকে যাওয়া ছেলে। আমি এক ভারস্বরূপ।

সেজ ভাই আই এ পাশ করল যখন সেই সময় পিতৃবিয়োগ হয়।

আমি সেই যে দেশ ঘর পরিত্যাগ করেছিলাম আর স্বগ্রামমুখোও হয়নি। মাতৃবিয়োগের সময় যখন গিয়েছিলাম তখন দুই ভাই যেন একটু অবহেলার চোখে দেখেছিল। বাড়ির বড় ছেলে যখন পিতৃ-সংসারের কোন কর্তব্যই পালন করেনি তখন মাতৃশ্রাদ্ধে এসেছ এস,—তার বেশি আর কিছুই নয়।

কলকাতায় তখন এখনকার মতন এত যাত্রা দলের সমারোহ ছিল না। কয়েকটি দল উত্তর কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলেঅবিশ্যি ছিল, কিন্তু সেখানে সম্মানজনক অভিনেত্রীর কাজে সহজে স্থান পাওয়া যেত না—বিশেষ করে আমার মত একজন অজ্ঞাত গ্রাম্য অভিনেতার পক্ষে।

মথুর সাহা কিংবা শ্রীচরণ ভাণ্ডারি বা সত্যেম্বর অপেরা পার্টি কোন যাত্রার দলেই পাত্তা পাইনি। পেয়েছিলাম কিন্তু ইংরেজ বণিক প্রতিষ্ঠানে স্টোর কীপারের চাকরি। আমার যে বিদ্যে বুদ্ধি আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাতে এ চাকরি পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু অভিনয় দক্ষতার গুণেই এই চাকরি লাভ।

আমার খুল্লতাত শ্বশুরমশাই ছিলেন অভিনয় প্রিয়। নিজেও সখের দলে অভিনয় করতেন।

কলকাতায় এসে বানের জলে ভাসছিলাম। উত্তর কলকাতা

বাগবাজার গঙ্গার ধারে বান্ধব সম্মিলনে এক বাড়ির বড় বৈঠকখানা ঘরে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের মহড়া দেখছিলাম। হরিশ্চন্দ্রের অমন পার্ট মার খাচ্ছে শৈব্যার অকৃতকার্যতায়।

সাহস করে রাস্তার ধার থেকে মহড়া দেওয়ার ঘরে উঠে গেলাম। আবেদন জানালাম শৈব্যার রোলের জন্যে, আমার কথায় সবাই অবাক। ট্রায়াল স্বরূপ শৈব্যার পার্ট কণ্ঠস্থ বললাম।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের নজর পড়ল আমার দিকে! আর তখনই আশ্রয় মিলল তাঁর বাগবাজারের গৃহে।

পৈত্রিক জন্মসূত্রে আমি সুপুরুষ যুবা। রাজা হরিশ্চন্দ্র কলকাতার এক বিলিতি অফিসের বড়বাবু—দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তার ভাইঝি পিতৃহারা বালিকা। শ্যামলী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা নয়—গায়ের রঙ কালো। চতুর্দশ বছরের অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যা। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়, তবে ব্রাহ্মণ—ছুরিত্তির ব্রাহ্মণ। কুলীনের কৌলিন্য খর্ব হয়. ছুরিত্তির ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে বিয়ে করলে।

চাকরির লোভে রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গত ভাইয়ের কন্যাকে বিবাহ করলাম। জামাই-আদর পেলাম যথাযথ। চাকরিতে পাকা হলাম বড়বাবুর কল্যাণে।

সেই থেকে আছি মধ্য কলকাতার শুরি লেনের দোতলা বাড়ির একতলার দু'খানি ঘরের ভাড়াটিয়া হয়ে। দু'টি সন্তান সন্ততির জনক। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে।

স্বল্পবিত্তের কেরানি হলেও স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গেই দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার শহুরে বাসিন্দা। ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে—ভদ্র পরিবেশে বসবাস।

খুল্লতাত শ্বশুর বিলিতি বণিক সংস্থার বড়বাবু রাজা হরিশ্চন্দ্র যদি জীবিত থাকতেন তা হলে স্থায়ী চাকরিটি নিশ্চয়ই খোয়াতাম না আর পদোন্নতিও কিছু ঘটত নিশ্চয়ই। কলকাতায় স্থায়ী বাড়ি করতে না পারলেও সাবেক কালের পুরোনো বাড়িতেই ইজ্জতের

সঙ্গে বসবাস করতে পারতাম।

আমাদের কালে স্নাতকপর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে এখনকার মতন এতবেশি আগ্রহ ছিল না। মেয়েদের মধ্যে তো নয়ই। কটা মেয়ে আর ডিগ্রি নিত? ছেলেরা ম্যাট্রিক পাশ করেই কারনিক পদের জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াত। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা আর মেধাবী ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষালাভ করত কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেই শিক্ষিত বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যেত। আমি কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্তও অগ্রসর হতে পারিনি। বার দুই গ্রামের হাইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন না পাওয়ায় পিতৃদেব রাগ করে বললেন—'ব্রাহ্মণের ঘরে চাষা জন্মেছে। কুপুত্তুর কোথাকার। লেখাপড়া তো হল না, যা ক্ষেতে গিয়ে লাঙ্গল চষগে যা।'

একটি মাত্র ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে কিছু না হোক নিজের অফিসেই ভালো কাজে ঢোকাতে পারতাম। মেয়েটিও লেখাপড়ায় ভালো। কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তাকে সুযোগ্য ঘরে বিয়ে দিয়ে পিতৃত্বের কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হতাম। আর পরিণত বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়ে তাকে সংসার ধর্মে দীক্ষিত করে রিটায়ার্ড লাইফে কাশীতে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের তীরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রশান্তির জীবন যাপন করার প্রতিবন্ধকতা কিছু ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের এই কামনাই ছিল আমার।

চাকরি জীবনে একবার স্বামী স্ত্রীতে পুত্র কন্যা সহ বারানসী তীর্থে ভ্রমণে গিয়েছিলাম। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাট সংলগ্ন একখানি বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে মাসাধিক কাল অবকাশ জীবন যাপন করি।

তখনই মনে এই কামনা প্রবল হয় যে পরিণত বয়সে জীবন সায়হ্নের বাকী ক'টা দিন এই গঙ্গা তীরেই স্বামী স্ত্রীতে বসবাস করব। কেদার ঘাটে পাঠ শুনব। গঙ্গা স্নান করব। আর সকাল সন্ধ্যে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করব।

কিন্তু তা হল কই ?

শাস্ত্রে বলে—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু !' সেই লোভের বশবর্তী হয়ে সবই খোয়ালাম। বিলিতি বণিক সংস্থায় স্টোর কীপারের কাজ করতাম। গাঁট গাঁট বিলিতি কাপড় আসত বিদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে।

আউটরাম ঘাটে জাহাজ বন্দরেই লটকে লট কাপড় পাইকারি হিসেবে বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের মহাজনেরা কিনে নিত। বাকী কিছু জমা হত অফিসের স্টোর্সে।

গুদামবাবু—আমি ভারপ্রাপ্ত রক্ষক।

এই কাজেই অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ঘটেছিল। বোম্বাই-এর পার্সি রাগানের শেঠ চৈতমল লালভানি আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে ওঠেন ব্যবসায় ক্ষেত্রে।

কী যে দুর্মতি হল আমার। সৎ ব্রাহ্মণ সন্তান—লোভের বশবর্তী হয়ে স্টোর্স থেকে কয়েক গাঁট কাপড় সরিয়ে চোরা বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে পাকা চাকরি খোওয়ালাম। ভাগ্যিস হাতে নাতে ধরা পড়িনি। তাই শুধু কর্তব্যহীনতা আর সন্দেহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কর্মচ্যুত হলাম।

অল্প বেতন। দিন আনি দিন খাই। সঞ্চয় কিছুই করতে পারি নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি নতুন করে এ বয়সে আর চাকরি লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

চোরা বাজারে যে অর্থ পেয়েছিলাম কলকাতা শহরে এই বাজারে চারজন প্রাণীর খেয়ে পরে বাড়ি ভাড়া দিয়ে কতদিন আর চলে।

ভাগ্য ভালো আর ঈশ্বরের পরম করুণা যে এ হেন দুর্দিনে বোম্বাই-এর পার্সি বাগানের বস্ত্র বিক্রেতা ধনী সিন্ধি চৈতমল লাল-ভানির সঙ্গে কলকাতা বড় বাজারে দেখা। দুর্ভাগ্যের কথা শুনে চৈতমল আমার সঙ্গে সদ্য হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করা ছেলে চুনীলালকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। চাকরি দিলেন তাকে নিজ প্রতিষ্ঠানে। দু'বেলা কোন রকমে দুটি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হল।

মণিমোহনকে চৈতরামের সঙ্গে দিয়ে তার হাতখানি চেপে ধরেছিলাম,—'ভাই, গরিব বন্ধুর তুমিই একমাত্র ভরসা। বড় প্রলোভনের জায়গা বোম্বে শহর। দেখো ভাই—অল্প বয়েসের ছেলে যেন কুসঙ্গে না পড়ে।'

চৈতরাম আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন,—'মুখার্জীবাবু, তুমি আমার দোস্ত। কোন ভাবনা নেই তোমার। মণি আমার আপন ভাতিজা। তাকে আমি ঠিক মানুষের মতন মানুষই করে দেব।'

চৈতরাম আমৃত্যু তাঁর কথা রেখেছিলেন। অল্প বয়স্ক ছেলের হাতে মাস মাইনের টাকা পর্যন্ত দিতেন না, পাছে সে অপচয় করে। সব সময়ে চোখে চোখে রাখতেন যাতে কুসঙ্গে না পড়ে। ছেলের মাস মাইনে প্রতি মাসে আমাকে নিয়মিত মনিঅর্ডার যোগে পাঠাতেন। মণিমোহন তাঁর কর্মচারী নয়। তাঁকে তিনি নিজের বাড়িতে রাখতেন। ভরণ-পোষণ যোগাতেন। প্রয়োজন মতন কিছু হাত খরচাও তার হাতে তুলে দিতেন।

বড় নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম চৈতরামের এই সহৃদয় ব্যবহারে।

একমাত্র মেয়ে পান্না,—সে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করল। এইবার তার বিয়ে থা দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য আমার, হঠাৎ হৃদরোগে চৈতরামের মৃত্যু হল।

চৈতরামের মৃত্যুর পর অবিশ্যি অকূল পাথারে ডুবে যাইনি। একমাত্র রোজগেরে ছেলে যার ওপর সমস্ত সংসার নির্ভরশীল সে এখন আমাদের সংসারতরণীর কাণ্ডারী,—মণিমোহন বোম্বাই দাদার বাজারে আরেক প্রসিদ্ধ শাড়ির দোকানে চাকরি পেয়েছে। মাইনে ঠিক কত,—তা আর আমার জানার কথা নয়। মণিমোহন ঠিক স্পষ্ট করে সে কথা জানায় না। তবে মাসে মাসে সংসার চালানোর খরচ পাঠায়। প্রতি মাসে ঠিক সমান পরিমাণের অর্থ নয়। তাই মুশকিলে পড়ে গেছি।

অকর্মণ্য ব্যর্থ পুরুষ আমি। না হলে সম্পূর্ণ ছেলের অর্থের ওপর হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হবে কেন? আমার মতন বয়সের

প্রৌঢ় লোকেরা এই কলকাতা শহরে এখনো তো কাজকর্ম করে রোজগারপাতি করছে। সেদিক থেকে সত্যিই অপদার্থ আমি।

এদিকে দেখতে দেখতে মেয়েটা বড় হয়ে চলল। পয়সা অভাবে তাকে আর কলেজে পড়াতে পারলাম না। আইবুড়ো মেয়েকে কত-দিন আর অনূঢ়া রাখা যায়? তার ওপর যা দিন কাল এখন। বয়স্থা কুমারী মেয়ের পা ফস্‌কাতে কতক্ষণ! এই তো সেদিন,—পাশের গাঙ্গুলি বাড়ির কলেজে পড়া বিশ বছরের মেয়ে অজাতের কোন এক বয়ফ্রেণ্ডকে বাপ মায়ের অজ্ঞাতে বিয়ে করে বসল। কী লজ্জা গাঙ্গুলি পরিবারের। জামাই জাতে ব্রাহ্মণ তো নয়ই, কায়স্থ কিংবা বৈদ্যও নয়। তার চেয়েও অনেক নিচু জাতের।

সিডিউল্ড কাস্টের বলেই বি-এ পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি দপ্তরে চাকরি পেয়েছে। তা না হলে বি-এ, এম-এ পাস করা শিক্ষিত ছেলেরা এখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ঘরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতায় কী ভীষণ বেকার সমস্যা আজকাল।

আর কী বরাত আমার! নিজে নিষ্কর্মা। ছেলে যা দয়াদাক্ষিণ্য করে মাসে মাসে পাঠায় তাই দিয়ে সংসার চালাতে হয়। ছেলেটি সুপুরুষ। এই বয়সেও আমার চেহারা ভালো। এটা আমার বংশ গত। আমার পিতৃপুরুষের সবাই সুন্দর সুশ্রী! মণিমোহন সেই পিতৃধারার চেহারা পেয়েছে। মেয়ে কালো, রোগা, লম্বা। মুখ চোখ অবিশ্যি ভালো।

পান্নার চেহারা অনেকটা তার মায়ের মতন। চাকরির লোভে আমি না হয় পান্নার মাকে বিয়ে করেছিলাম। মেয়ে ফর্সা কি কালো, সুন্দরী কি অসুন্দরী—এসব কিছু তাকিয়ে দেখিনি।

টাকা নাইবা সঞ্চিত থাকুক—মেয়ের বিয়ের খরচ কেমন করে যোগাড় করব এসব সমস্যা না ভেবে চিন্তে গৃহিণীর তাগিদে অস্থির হয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য হয়ে খুঁজে পেতে দু'একটি পাত্রের সন্ধান এনেছিলাম। অতি সাধারণ ছেলে। সামান্য মাত্র লেখাপড়া জানা, —চাকরিও সামান্য। তাদের দেমাক কত! মেয়ে কালো। নগদ-

বরপণ যৌতুক আর সোনা দানা গয়নায় মেয়েকে মুড়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই যার—সে বাপের আবার বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ছোঁওয়ার কামনা কেন ?

এমনি অবস্থায় আবার ঘোরতর বিপর্যয়। একমাত্র রোজগেরে ছেলে প্রায় দশ দিন ধরে নিরুদ্দেশ। তার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না।

পান্নাই এ যাত্রা বাঁচিয়েছে। তা না হলে সংসার আজ মরুভূমি হয়ে যেত। বোম্বাই গিয়ে পান্না তার দাদার কর্মস্থলে চাকরি নিয়েছে। এখন মেয়েটিই একমাত্র ভরসা। বাপ হয়েও বলছি,—স্বার্থ কি ভয়ঙ্কর জিনিস !

ঈশ্বর করুণা করেছেন যে পান্নার বিয়ে হয়নি। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ে পরের ঘরে চলে যেত। স্বামী-স্ত্রীতে তাহলে অনশনে শুকিয়ে মরতে হত।

কী হল মণিমোহনের ? চাকরি-বাকরি ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তিনি নিজে অকর্মণ্য, অসহায়। কোথায় আর নিরুদ্দেশ ছেলের খোঁজ খবর করবেন ? কিন্তু তার মনিব তো কসুর কিছু করছেন না। শুধু বোম্বে 'ক্রনিক্যালে' নয়, কলকাতার ইংরেজি সংবাদপত্র 'স্টেট্সম্যানে'ও মণির সন্ধানে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। পলাতককে আশ্বাস দিয়েছেন ফিরে এসে কাজে যোগদান করবার জন্যে।

পান্নার নামে গত কালকের বাংলা খবরের কাগজ আনন্দবাজার পত্রিকাতে নিরুদ্দেশ কলমে বেশ বড় বিজ্ঞাপনই প্রকাশিত হয়েছে—'দাদা, তুমি যেখানেই থাক ফিরে এস। তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আমি বোম্বেতে পানওয়ানি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। যদি অসুস্থ হয়ে থাক—আমাকে কিংবা বাবাকে খবর জানাও।'

পান্নার জবানিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এরপর মণির আর আত্মগোপন করে থাকার কোন অর্থ নেই।

আমি বুঝেছি মণি কুসঙ্গে পড়ে মনিব পানওয়ানির টাকা নষ্ট

করেছে। সে অধঃপাতে গেছে।

আমার কথা কিন্তু আমার স্ত্রী আদৌ বিশ্বাস করেন না। মায়ের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছেলে তাঁর ভয়ঙ্কর এক বিপদআপদের সম্মুখীন। স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে নেই সে। এমন নিরুপায় অবস্থার মধ্যে আছে যে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না—খবরাখবর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

প্রায় এক সপ্তাহ কাল ধরে মণিমোহনের কোন খবরাখবর নেই। সব রকমের চেষ্টা চরিত্ত কবেও কোন ফল হচ্ছে না।

পান্না প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে বোম্বে থেকে একখানি করে সবিশদ চিঠি লেখে। মালিক প্যানওয়ানি সাহেব তাকে কন্যা স্নেহে প্রতিপালন করছেন। যত্ন করে তাকে কাজকর্ম শেখাচ্ছেন। কোন অসুবিধেই তার নেই। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তার দাদার কোন সংবাদ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।

তবে কী সত্যি সত্যিই মণিমোহন আর বেঁচে নেই? বোম্বে মেইলের ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের কথা খবরের কাগজে পড়েছি। মৃত দু'জন। আহত তালিকায়ও মণিমোহনের নাম নেই।

তাহলে?

আচ্ছা, গয়া এবং হাজারিবাগ হাসপাতালে একবার খোঁজখবর নিয়ে দেখলে কেমন হয়?

ঠিক তাই।

হাজারিবাগ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম—'মণি সিরিয়াসলি ইল। হাজারিবাগ হস্‌পিট্যাল। কাম সার্প।'

টেলিগ্রাম প্রেরিকার নাম আমার অপরিজ্ঞাত। এ নামের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই। দুটি মাত্র অক্ষরযুক্ত নাম—মুক্তো।'

কে এই মুক্তো? যেই হোক-না কেন দুর্ভাবনাগ্রস্ত একটি পরিবারের সে যে পরম আপনজন তাতে আর কোন্ সন্দেহ নেই।

মুক্তোর টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই পর পর আরো দু'টি তার

পেলাম বোম্বে দাদার থেকে পানওয়ানি সাহেবের এবং হাজারিবাগ থেকে পান্নার কাছ থেকে। পানওয়ানি সাহেব টেলিগ্রাফিক মণি-অর্ডারে কিছু টাকাও পাঠিয়েছেন। তাঁর বদন্যতায় মুগ্ধ হলাম। কিন্তু মুক্তো—যে মেয়েটি সর্বাগ্রে মণির জীবন রক্ষায় হাজারিবাগ হাসপাতালে মণিকে ভর্তি করেছে—কে সে রমণী?

মুক্তো! সে এক রত্ন বিশেষ!

সত্যিই রত্ন।

হাজারিবাগ হাসপাতালে গিয়ে তাকে দেখলাম। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। এখানকার অধিবাসিনী নয়। মণির চিকিৎসার ব্যবস্থা, তাকে দেখাশোনা করা, শুধু তাই নয় হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয়ভার সবই এ মেয়েটি বহন করছে। অথচ জানলাম মেয়েটির সঙ্গে মণি-মোহনের বিশেষ কিছু আলাপ পরিচয় নেই।

বোম্বে মেইল ট্রেন একসিডেন্টের বিপর্যয়ে পড়ে মেয়েটি হাজারি-বাগ স্টেশন রোডের অশোকা হোটেলে আশ্রয় নেয় কলকাতা যাওয়ার পথে। হোটেলে মণিমোহনকে এইরকম অসুস্থ অবস্থায় দেখে হাসপাতালের ব্যবস্থা সেই করেছে। সাধারণ রোগীর মতন মণিকে ফ্রিওয়ার্ড বেডে রাখা হয়নি, এমন কি পেয়িং ওয়ার্ডেও নয়। মণির জন্যে আলাদা কেবিন ভাড়া নেওয়া হয়েছে, স্পেশ্যাল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং ট্রেইণ্ড নার্স। কত খরচের ব্যাপার!

আমার স্ত্রী মুক্তোকে বুকে জড়িয়ে ধরেন,—'তুমি আমায় সত্যি-কারের আপন জন।'

মুক্তো হেসে বলে,—'আপকা আউর এক লেড়কী!'

আমি বললাম,—'ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন মা। তা না হলে ছেলে আমার বাঁচত না।'

'এ্যাত্তনা কুছ নেই। আতুর অসুস্থকে দেখা এ তো মানুষের পবিত্র ধর্ম। আমি তার সামান্যটুকু মাত্র করেছি।'

মুক্তোর কথায় আমার চোখে জল এল। গলা রুদ্ধ হয়ে গেল

আবেগে। কৃতজ্ঞতার কোন ভাষাই মুখ থেকে বের হল না।

'এত টাকা খরচ করেছ মা। আমরা কী করে তোমার ঋণ শোধ করব?'

'ও সব পিছু কী বাত। বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আপনার ছেলের অবস্থা দেখে। আশঙ্কা হয়েছিল,—হয়ত বাঁচান যাবে না; কিংবা সারাজীবন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে।

চীৎকার করে আমার স্ত্রী কেঁদে উঠে বলল,—'তাহলে কী মণি আমার সারবে না?'

মুক্তো আশ্বাস দিল,—'হ্যাঁ, ডাক্তার ভরসা দিয়েছেন সারবে। তবে সময় নেবে। আর ইমোশনে আরো ক্ষতি হবে বলে ডাক্তারের নির্দেশে এখনো আপনাদের ছেলের কাছে নিয়ে যেতে পারছিনে।'

আমি মুক্তোকে জিগ্যেস করলাম,—'হ্যাঁ মা, তোমার পরিচয় কী? তুমি মণিকে চেন? তোমার বাড়িও কী বোম্বেতে?'

মুক্তো তবুও কিন্তু আত্মপরিচয় গোপন করে গেল। সে যে আমার বন্ধু বোম্বে পার্শি বাগানের লালভানি সাহেবের কন্যা—তা প্রকাশ করল না। শুধু বলল—লক্ষ্ণৌতে মণির সঙ্গে তার পরিচয়। সে মণির কাস্টোমার। মণি শুধু শাড়িই বেচে না—সে জুয়েলারী রত্নও বিক্রি করে।

কিন্তু কী অসুখ মণিমোহনের? হঠাৎ এমন করে হোটেলের ঘরের মধ্যে সুস্থ সাবালক যুবা ছেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বাক্‌শক্তি এবং বাহ্যিক চেতনাকে হারিয়ে ফেললেই বা কেমন করে সেই কথাই তো সর্বাগ্রে জানা দরকার।

মুক্তো সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল—'ডাগ্‌ভারকো আনে দিজিয়ে। তিনিই সব বলতে পারবেন। আর তাঁর বিনা অনুমতিতে রোগীর সঙ্গে মুলাকাৎও হতে পারে না। তাতে বুঝিবা বিপদের আশঙ্কা আছে।'

'একবার কী চোখের দেখাও দেখতে পাব না আমার ছেলেকে?'—আমার স্ত্রী সাশ্রু নেত্রে আবেগ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন

মুক্তোকে।

'নেহি মাতাজী, আভি নেহি।'

মুক্তো হাসপাতাল থেকে আমাদের নিয়ে এল তার হোটেলের কক্ষে। খাবার-দাবারের আয়োজনও করল। মুক্তোর ঘরের পাশের ঘরে মুক্তোই খাবার দাবার ব্যবস্থা করেছে।

এমন মেয়ের সার্থক নাম মুক্তো। এ মুক্তো আসল মুক্তোই। উজ্জ্বল এক হীরে জহরৎ তুল্য।

বিকেলের দিকে বোম্বে থেকে পানওয়ানি সাহেবও এসে পৌঁছল। পান্না আগেই এসে পৌঁচেছে, কিন্তু মণির আসল ব্যাধির কথা সে কিছুই জানে না। হাসপাতালে ছুটে গেলাম। বড় স্পেশালিস্ট ডাক্তারও এসে গেছেন।

পানওয়ানি সাহেবের প্রশ্নে ডাক্তার যা বললেন তাতে চমকে উঠলাম আমরা সবাই। কী কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে মণিমোহন। হ্যাঁ, যে মণিমোহন ভরদ্বাজ মুনির বংশজাত ব্রাহ্মণ কুমার সেই দ্বিজ বংশের ছেলে মণিমোহন বেশ্যাসক্ত হয়ে যৌন ব্যাধিগ্রস্ত। পক্ষাঘাতে বাকশক্তি হীন।

ব্যর্থ পিতৃত্বের অনুশোচনায় অন্তর আমার দগ্ধ হতে লাগল। ওঃ, এর চেয়ে ছেলের মৃত্যুর সংবাদও যে শ্রেয় ছিল!

পান্না লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল।

পানওয়ানি পর্যন্ত রাগে ফেটে পড়লেন—'উল্লু একদম বেসরম। ঝুটা, বেইমান। বেহেস্ত!'

আমার স্ত্রী শুধু বুককাটা আর্তনাদে বলে উঠলেন,—'ওসব কথা এখন থাক। ও বেঁচে উঠলে সেরে গেলে সব কলঙ্ক মুছে যাবে। আংটি আবার বেঁকা, বেটাছেলের আবার চরিত্র। বয়েসকালে অমন একটু আধটু দোষ অনেক ছেলেই করে থাকে।'

পানওয়ানি সাহেবও একথায় সায় দিলেন বৈকি। তা না হলে ভি.ডি. স্পেশালিস্ট ডাক্তারের সঙ্গে অমন মনখোলা আলাপ-

আলোচনা করতে লাগলেন কেমন করে ?

মুক্তোর কথা মনে হল আমার।

পানওয়ানি সাহেব আর পান্না আসার পরই সে যেন কোথায় বেরিয়েছে। মুক্তোর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপে এবং ব্যবহারে বেশ অনুভব করছি যে বেশ রুচিসম্পান্না এবং শিক্ষিতা মেয়ে।

নিজের স্বার্থ নিয়ে এতই অন্ধ ছিলাম যে তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারিনি। মানুষ অবিশ্যি এমনি হয়। তখন সমস্ত ছুনিয়া জুড়ে মন শুধু ছিল মণিময়। মণির এ দশা কেমন করে হল, সত্যিই সে একেবারে নিরোগ হয়ে উঠবে কি না,—এই ভাবনাতেই মগ্ন ছিলাম।

সবচেয়ে অস্বস্তি লাগছিল—হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় রোগীকে দেখার অনুমতি পাইনি। যে কেবিনে মণি ছিল—সেখানে শুধু একজন ট্রেইণ্ড নার্স।

তার সঙ্গেও আমাদের কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি, শুনে-, ছিলাম মণি অজ্ঞান এবং অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

দরজার বাইরে থেকে পর্দা সরিয়ে একবার শুধু উঁকি দিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে অসুস্থ বাহ্যিক চেতনাহীন মণিকে দেখেছিলাম মাত্র। চোখ বন্ধ করে মণি শুয়ে আছে। বিকৃত মুখাকৃতি। হাত পা সব তার বাঁধা। গ্লুকোজ ফিডিং করানো হচ্ছে।

আমার স্ত্রী আকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—'একবার কী কাছে গিয়ে মণির স্পর্শ করতে পারিনে ?'

'প্লিজ, না।' নার্সের উত্তরের পর আমাদের ছু'জনকেই সংযত হতে হয়েছিল।

তবু একবার ভাঙা চোরা ইংরিজিতে নার্সকে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম—'ইজ দ্য পেশেন্ট আউট অফ ডেঞ্জার নাউ? রোগী কী একবারও চোখ খুলছে না? একেবারেই কী জ্ঞান নেই?'

নার্স এসব কথার কোন উত্তর দেয়নি।

হাউস সার্জেনও কোন কথাই বলেননি আমাকে।

কী আশ্চর্য! আমি রোগীর বাবা। প্রকৃতপক্ষে মণির যে কী অসুখ, কি রকম অবস্থা, কতদিন লাগবে জ্ঞান ফিরে আসতে—এসব কী জানার অধিকার আমার নেই?

মুক্তো যে হোটেলে ছিল সেখানেই পানওয়ানি সাহেব আমাদের থাকারও ব্যবস্থা করলেন। মণির বাবা হয়েও ছেলের যে কুৎসিত যৌন ব্যাধির কথা জানতে পারলাম তাতে মুখ তুলে যেন আমি আর কারুর সামনেই দাঁড়াতে পারিনে। এমন কী হাসপাতালের ডাক্তারের সামনেও লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকি।

মুক্তোর পরিচয় পানওয়ানি সাহেবই দিলেন—'বেসরম লেড়কী! বোম্বাই পার্সি বাগানের অত বড় সম্মানিত ব্যবসায়ী চৈতমল লালভানি—তার মেয়ে হয়ে কিনা শেষে এই জীবন!'

আমি মুক্তোর পরিচয় জেনে বুঝলাম সে আমার বন্ধু কন্যা—যে বন্ধু আমার পুত্রকে চাকরি দিয়ে আমার সমগ্র পরিবারের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

এত লেখাপড়া শিখে, কত বড় ঘরে সাদি হয়েও বাইজীর জীবন-যাত্রা! বোম্বাইয়ে কে না জানে চেনে লক্ষ্ণৌ-এর মুক্তোবাইকে? কে না জানে ওর কথা? নাচ গানে চলচ্চিত্রের খ্যাত নাম্নী চিত্রতারকা। পানওয়ানি সাহেব এ কথা বলে ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রলেন।

আমরা হাজারিবাগে পৌঁছানোর পর মুক্তো নিজেকে রোগী এবং আমাদের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে নিতে লাগল। পানওয়ানি সাহেব আর পান্না হাজারিবাগে আসায় মুক্তো তার নিজের দৈন্যকে বেশি বড়, বেশি স্পষ্ট করে অনুভব করায় নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

পানওয়ানি সাহেব দু'একদিন থেকেই বোম্বাই যাত্রা করলেন, আমাদের ছেলে আমরাই এবার যেন দেখাশোনা করি।

ব্যবসা পত্তর ছেড়ে আর কতদিন তিনি এভাবে এখানে পড়ে থাকবেন? তবে অশেষ করুণা তাঁর পান্নার হাতে একতাড়া নোট

দিয়ে গিয়েছিলেন মণির চিকিৎসা পত্তর এবং হোটেলে আমাদের খাই খরচা বাবদ।

পানওয়ানি সাহেব তাঁর কর্মচারীকে আমাদের কাছে রেখে গেলেন মণিকে দেখাশোনার জন্যে। মুক্তো তবুও আমাদের পরিত্যাগ করল না। কিছুদিন পরে মণি একটু সুস্থ হলে তাকে বাধ্য হয়েই কলকাতায় গিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠতে হয়েছিল একটা বাংলা ছবির স্যুটিং-এর জন্যে। গান আর নাচের ভূমিকা ছিল। সে কাজ সেরে সে ফিরে যাবে লক্ষ্ণৌ—তার নিজ বাসস্থানে।

মণি তখন খানিকটা আরোগ্যের পথে। আমরা কলকাতায় ফিরে গেলাম—মধ্য কলকাতার সেই সুরি লেনের একতলার দু'খানি ঘরে।

মণিকে আবার ফিরে পেয়েছি। কর্মক্ষম হতে তার এখনো অনেক দিন সময় লাগবে। পান্নাকেও ফিরে যেতে হবে বোম্বাই দাদার বাজারে—পানওয়ানি সাহেবের কাপড়ের গদিতে। অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি—তাঁর কাছে প্রকৃতিই ঋণী আমরা।

আর আশ্চর্য হয়ে ভাবি—প্রকৃতপক্ষে যে মেয়েটির যত্নের সীমা-পরিসীমা নেই, যার অকাতর অর্থ ব্যয়ে এবং সহায়তায় আমরা কোলের ছেলেকে কোলে ফিরে পেলাম—তার ঔদার্যের কতটুকু মূল্য আমরা দিতে পেরেছি?

চরিত্রহীন পুত্রের জন্যে পিতার মাথা হেঁট হয়েছে, লম্পট অগ্রজের লজ্জাজনক রোগের কথা জেনে পান্না শুধু আমাদের সামনে কেন এমন কী হাসপাতালের ডাক্তার এবং নার্সের সামনেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

তবুও মুক্তোবাই-এর প্রতি তার যেন শ্রদ্ধাবোধ নেই, বিদায় দেওয়ার সময় শুধু মোটামুটি ধন্যবাদ জানিয়েই সে তার কর্তব্য শেষ করেছে।

ব্যতিক্রম দেখলাম শুধু মণির মায়ের বেলায়। তিনি মুক্তোকে

আদরে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'সত্যিই তুমি আমার মেয়ে মুক্তো। আমার সৌভাগ্য তুমি আমাকে মা বলেছ। তুমি আমার নিজের মেয়ে পান্নার চেয়েও অনেক বেশি আপনজন। তোমার জন্যেই আমার মণিকে আবার ফিরে পেয়েছি!'

মুক্তোর চোখেও জল এলো—'মা আমার মা!'

চৈতন্য ফিরে পেয়ে মণি যখন তার মায়ের বুকে মুখ রেখে শিশুর মতন ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল তখন ডাক্তার এবং নার্স এসে আমাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিল—সরে যায়নি শুধু মুক্তো।

৯

॥ মুক্তোর কথা ॥

আমার জীবনের কথা আমি তো বলেইছি। আমি সিদ্ধি বংশের অভিজাত কন্যা—পর পর দুবার বিয়ে করেও সুখী হতে পারলাম না। নারীর চিরদিনের যা কাম্য জায়া এবং জননী হয়ে সংসার জীবনের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত আমি। দেহের ভালোবাসার ক্ষুধা আমার মিটেছে, কিন্তু মনের ভালোবাসা দেহের ভালোবাসার চেয়েও যে অনেক বড় তা যেন হাজারিবাগে এসে প্রকৃতপক্ষে অনুভব করলাম আমি।

মনের ভালোবাসায় পেলাম মণিমোহনকে। মণি—আমার মণি। সে আমাদের দোকানের নগণ্য একজন কর্মচারি, যাকে কোনদিনই চোখের দেখায় তেমন করে দেখিনি। হঠাৎ ভাবে মনের দেখায় স্পষ্ট করে দেখলাম—হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবাসি। প্রকৃতই ভালোবাসি। দেহের সান্নিধ্যে তাকে পাইনি বটে, কিন্তু মনের সান্নিধ্যে যেদিনই সে আমার আপনজনই হয়েছিল। বার বার সে আমার কাছে আসতে চেয়েছিল—পার্সিবাগানে আমাদের বাড়িতে, জুহুর সমুদ্র সৈকতে, লক্ষ্নৌ এবং পন্নাতে, কিন্তু কোনখানেই সে আমার

কাছ থেকে কোন সমাদর এবং স্বীকৃতি পায়নি। তার সুপুরুষ চেহারা, আমার প্রতি তার সম্ভ্রমবোধ এবং তার গোপন ভালোবাসা অস্বীকৃত থেকে গেছে আমার কাছে।

আমিই কী কখনো অনুভব করেছি যে আমার মনের অভ্যন্তরে তার প্রতি ভালোবাসার ফল্গু প্রবাহ—বাইরে বালির আস্তরণে তা ছিল ঢাকা।

গয়াতে সে আমার কাছে এসেছিল হীরে মুক্তো বেচতে। সেগুলি যে নকল তা আমার জানা। তবু তাকে অনুকম্পা দেখিয়েছিলাম কিছু টাকা দিয়ে। পরে অনুতাপে ভুগেছি। অতগুলি টাকা না পেলে সে হয়ত অমন কুপথে পা দিত না, যার ফলে তার অমন কুৎসিত যৌনব্যাধির আক্রমণ। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাকশক্তিরহিত মণিকে দেখে প্রথমে ঘৃণা হয়েছিল আমার ; কিন্তু প্রেম এমনই যে সেই ঘৃণা সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হল আমার নিজেরই অজ্ঞাতে। আমার অবচেতন মনে সে যে প্রেমিকের আসন অধিকার করেছিল এখন আর তা অস্বীকৃত নয়। তা না হলে লাজলজ্জা সম্মান সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করালাম অমন করে কেন? মণির জন্যে কম অর্থ ব্যয় করিনি।

অর্থ ক্ষতির জন্যে আমার কোন অনুশোচনা নেই এখন আর। কিন্তু অপমানের জ্বালাটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিনে! আমার নিজের সম্প্রদায়ের লোকের কাছ থেকেই মণির জন্যে সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছি। আমাকে দেখে পানওয়ানি শেঠজি যখন মণির বাবা-মায়ের সামনে 'বেসরম লেড়কি' বলে আমার পরিচয় দিল তখনই মনে হয়েছিল পানওয়ানিকে আমি উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিই। পানওয়ানির আসল ব্যবসার কথা সর্বসমক্ষে জানিয়ে দিই।

পানওয়ানির ইতর ইঙ্গিত আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। আমার সঙ্গদোষেই মণির যেন এমন কুৎসিত রোগের আক্রমণ। নকল মুক্তোগুলি আমার কাছে আছে। মণির কাছ থেকে আসল মুক্তোর দামে কিনেছি আমি। আর মণির স্যুটকেসে পানওয়ানির আসল

ব্যবসার প্রমাণ নকল হীরেও আছে। পুলিশে আমি খবরও দিতে পারতাম; কিন্তু মণিও তাতে রেহাই পেত না—এই ভেবেই ওপথে আর গেলাম না। নিঃশব্দে পানওয়ালির অপমান গায়ে মেখে নিলাম।

হাজারিবাগ থেকে কলকাতায় ফিরবার পথে মন আমার মণিময় হয়ে ছিল।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত যৌন ব্যাধি আক্রান্ত মণি আবার সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে দেখলাম। সে তার আত্মীয় স্বজনকে যদিও তেমনভাবে চিনতে পারছিল না, কিন্তু আমাকে দেখেই সে সম্ভ্রমে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাল। তার দু'চোখ ভরা জল। অনুশোচনার, না কৃতজ্ঞতার—আমি তা সঠিক অনুমান করতে পারিনি; কিন্তু আমার কলকাতায় রওনা হওয়ার সময় হাসপাতালে তার বেডের পাশে আর কেউই ছিল না। আমার প্রতি তখনকার সে দৃষ্টি যে অন্তরমথিত ভালোবাসার দৃষ্টি তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি! তবু আমি নিজেকে সামলে নিলাম।

'মোণি, হাম যা রাহা!'

মণি কিছুক্ষণ আমার দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর অতিকষ্টে তার কাঁপা ডান হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি তার মেলে ধরা দক্ষিণ কর স্পর্শ করলাম।

থর থর করে সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে। হু হু করে দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা তার গণ্ডদেশকে পরিপ্লাবিত করে তুলছে।

নার্স এসে আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পিছন দিকে তখন ফিরে তাকাইনি।

আমার কলকাতায় যাওয়ার ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। আর দেরি করা চলে না। মণির বাবা সহস্রবার আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

মণির মায়ের কথা আমি ভুলতে পারছিনে। তিনি আমাকে সস্নেহে বুকে টিপে ধরে বললেন, 'মেয়েমানুষের জন্তে যে আশীর্বাদ—

সে আশীর্বাদ তোমাকে আর করে লাভ নেই মা। তুমি শিল্পী. দেশজোড়া তোমার নাম হোক শিল্পের মধ্যেই তুমি জীবনকে পরিপূর্ণতায় গড়ে তোল—এই কামনাই করি মা।'

ভক্তিতে অবনত হয়ে আমি তাঁকে প্রণাম করেছিলাম।

তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শেষকথা বলেছিলেন—'মা বলে ডেকেছ আমায়, সেকথা যেন ভুলো না। তোমার মতন মেয়ের মা হওয়ার কতবড় সৌভাগ্য আমার আমি তা মুখের কথায় বলে বোঝাতে পারছিনে।'

নিজের মাকে দেখেছি—অভিজাত পরিবারের অভিজাত ঘরণী ও অপরূপ সুন্দরী ছিলেন।

মণির বাবা সুপুরুষ, মণির মা তা নন। তিনি বর্ণে কালো। দেহ সৌন্দর্যও সুরূপা নন; কিন্তু কালো রঙের ভেতর যে উজ্জ্বল আলো—তা তাঁর আচার-আচরণ। কোনদিনই আমি তাঁকে ভুলতে পারব না।

কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে ক'দিন থাকা। টালিগঞ্জ স্টুডিওতে স্যুটিং-এর কাজ ক'দিন। খুবই ব্যস্ততার মধ্যে জীবন যাপন।

তারপর আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসা। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে চিরন্তন নারীর আদর্শময় ঘরোয়া জীবন নয়। আমি নর্তকী, গায়িকা এবং অভিনেত্রী মুক্তোবাই—আমার নারী জীবনের এই হচ্ছে সত্যিকারের পরিচয়। তবু ব্যতিক্রম এইখানেই যে মণির সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা নিছক অভিনয়ের নায়িকার সম্পর্ক নয়। আর মণির মাকে পেয়ে আমি আর মাতৃহারা নই।

১০

॥ মণিমোহনের কথা ॥

প্রেম শুধু চোখের নেশা নয়—দেহের ক্ষুধাও নয়।

জীবনের এই পরম পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? এই দুর্লভ রত্নকে অবশেষে পেয়েছি অনেক মেকী রত্নের মাঝখান থেকে—মা

দিয়ে পতিত জীবনের মধ্যেও এই একমাত্র অহঙ্কার আমার।

আঠার বছর বয়েস থেকে কর্মজীবনে নামতে হয়েছে আমাকে অক্ষম পিতার সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে। লেখা পড়া শিখে সমাজে উপযুক্ত সম্মানের অধিকারী হতে পারিনি।

শাড়ির বাণ্ডিল ঘাড়ে নিয়ে এ জায়গা সে-জায়গা ঘুরে ফিরে ব্যবসায়ীর কৃপণ হাতের দেওয়া সামান্য পারিশ্রমিকে একটি তরুণ জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা মরুময় হয়ে উঠেছে।

জীবনের রাজপথে আমি উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি—হা অর্থ, হা বিত্ত করে। কী পেয়েছি?

কী পেয়েছি তার হিসেব মিলিয়ে নেওয়ার অবকাশ মেলেনি—শুধু বেঁচে থাকা।

শুধু দিন যাপনের গ্লানি।

থেকে থেকে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যে বয়েস ভোগের বয়েস, ফুর্তির বয়েস, আনন্দ সঞ্চয় এবং উপভোগের বয়েস, স্বপ্ন দেখার বয়েস—সেই বয়সে তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম দিয়ে উপার্জনের অর্থ অক্ষম পিতার সংসার প্রতিপালনের জন্যে ব্যয় করতে মন থেকে থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। নিজের সুখ, বাসনা কামনার কী কোন দামই নেই?

বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম ক্রমশ।

চারদিক ভোগ বিলাস আর ইন্দ্রিয় উপভোগের উপকরণ। আমি কেবল সেখানে ভিখিরির মতন উৎসব সমারোহের দ্বারে হ্যাংলা দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি।

হায়রে জীবন!

এই দুঃখভরা শাড়ি কাপড় ফিরিঅলাকে কোন মেয়ে ভালোবাসতে পারে?

কর্মজীবনে অপ্রতিষ্ঠিত, ব্যর্থ, পরাজিত পুরুষের চোখে রোমান্সের কোন্ রঙই বা থাকতে পারে?

অথচ শুনি নাকি মেয়েদের দৃষ্টিআকর্ষণকারী চেহারা আমার!

কিন্তু ব্যর্থ পুরুষের পৌরুষ কোথায়? ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোন্ মেয়ে তাকে স্বীকৃতি জানাবে?

বোম্বেতে যে দোকানে চাকরি নিলাম তার মালিক আমার পিতৃ-বন্ধু। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন—অমর্যাদা দিতেন না। কিন্তু তাঁর বাড়ির আর সকলে—তাঁর মেমসাহেব স্ত্রী, দুই ছেলে এবং এক মেয়ে তাঁদের কাছে আমার মর্যাদা কোথায়? আমি তো আর পাঁচ জন লোকের সমান।

মালিক লালভানি সাহেব সিন্ধি। সিন্ধি পরিবারের ছেলে মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে ধনী এবং সুন্দর চেহারার। তারা আমাকে নিতান্ত উপেক্ষার চোখেই দেখে থাকে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার যোগ্যতাই বা আমার কই? সারাদিনই আমি দোকানের মাল কেনা বেচা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তারপর কাজকর্ম যখন শিখলাম তখন আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয় নানা জায়গায় শাড়ি কাপড় বিক্রি করার জন্যে। মাইনে কী পেতাম তাও জানিনে, কেননা মালিক আমার বাবার বন্ধু। আমার মাইনের সব টাকাটাই তিনি মাস কাবারে বাবাকে মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দিতেন। আমার যা প্রয়োজন তা অবিশ্যি পেতাম। হাত খরচ ট্রেন ট্যাক্সি ভাড়া হোটেলে থাকার ফুডিং লজিং এক্সপেন্স।

সে আর কতই বা এমন?

বোম্বে পার্সি বাগানের ধনী ব্যবসায়ী লালভানি সাহেবের ছেলেরা কেতাদুরস্ত। বাড়িতেও ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। বড় ছেলে বাপের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ে বসে গেছে। আর দুই ছেলে সাবালকত্ব পাবার জন্যে ব্যস্ত। খাতা দুলিয়ে মোটরে চড়ে কলেজে যায়।

একটি মাত্র কুমারী মেয়ে, আমার চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট। মাথার দুপাশে বেনী দুলিয়ে স্কুল ড্রেস ফ্রক পরে প্রথমে তাকে কন-ভেন্টের শিক্ষায়তনে যেতে দেখতাম। কী সুন্দর তার চেহারা।

আপেলের মতন তার কচি গালের রঙ।

সেই কিশোরী মেয়ে দেখতে দেখতে যুবতী হয়ে উঠল। আপেলের রঙ গোলাপে পরিণত হল। হাসতে গেলে গালে টোল খায়। তখন তবু আমি তার কাছাকাছি যেতে পারতাম। বড় লোকের মেয়ে—আমার মনিব কন্যা; কিন্তু তার কিশোরী মনে বাড়ির আভিজাত্যের ছায়া ততখানি পড়েনি। একদিন আমাকে জিগ্যেস করেছিল—'এই বয়সেই পড়াশুনা ছেড়ে তুমি কাজ করছ কেন?'

উত্তরে বলেছিলাম—'পেটের দায়ে।' সে সহানুভূতি দেখিয়েছিল, 'আহা!' তারপর স্কুল থেকে কলেজ

সে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিল। তখন তার মধ্যে বেশ পরিবর্তনের ভাব। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ব্লাউজ, ম্যাক্সি, বেলবট্‌স, লেডীস গেঞ্জী—রূপ আর উদ্ধত যৌবন, তখন আর তার সঙ্গে শাড়ির দোকানের নোকরের কী করে মেলামেশা ঘটতে পারে?

স্কুলে পড়ার সময় তবু চোখাচোখি হত, কখনো কখনো ফিকে হাসির বিনিময়—এটা সেটা আনা-নেওয়ার ফাই ফরমায়েস। বড় হলে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবহার। সম্ভ্রান্তা উচ্চ শিক্ষিতা সুরূপা মনিব কন্যার প্রতি নোকরের সমম্ভ্রম দৃষ্টিপাত ছাড়া অপর কিছুই নয়।

লালিমা। লালিমার লাবণ্যের পাশে আমার স্থান কোথায়? তবু দেখেছি—

একটি জীবনের ফুটন্ত রূপ। একটি ফুলের ক্রম বিকাশ।

লালিমার বিয়ের দিনের কথাও আমার মনে পড়ে। কনে সাজা বধূর রূপ, পিতৃ সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার শূন্যতা পিতৃ-ভবনে। সে শূন্যতা আমাকেও স্পর্শ করেছিল কেন?

লালিমার বিয়ের আগে প্রতিদিন তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হত। আমি কাজকর্মে প্রায়ই বাইরে থাকতাম—এ জায়গা সে জায়গা, এ প্রদেশ সে প্রদেশ আমাকে ঘুরে ফিরে বেড়াতে হত। এমন কী পার্সি

বাগানের বাড়িতেও নোকর মহলের সঙ্গে মনিব মহলের বিস্তর ব্যবধান—তারই মধ্যে এক আধবারের দৃষ্টি বিনিময় আমার মরু জীবনে বর্ষণের স্নিগ্ধতা আনত। আমার পিপাসিত হৃদয়ে তাই ছিল তৃষ্ণা নিবারণ।

বোম্বাই-এ পার্সি বাগান থেকে চলে এলাম। লালিমার সঙ্গে চির বিচ্ছেদ।

লালিমা বিলেত ফেরৎ স্বামীর সম্ভ্রান্তা স্ত্রী।

কিন্তু যেদিন শুনলাম তার নারী-জীবনের ব্যর্থতার কথা সেদিন আমার মন অমন করে কেঁদে উঠেছিল কেন?

লালিমাকে হয়ত ভুলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন আর খবর রাখতাম না তার।

মানুষের মন একজনকে অবলম্বন করে ওঠে। প্রথম কালে বাবার কলকাতার সাংসারিক আবহাওয়ায় স্নেহপ্রীতি বন্ধনে আমার জীবন রসসিঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। পারিবারিক বন্ধন আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। তাই না হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেই কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে তেমন কিছু বেদনা অনুভব করিনি।

বম্বে পার্সি বাগানে থাকলেও মনটি জুড়ে থাকত আমার বাবার মার প্রতি কর্তব্যবোধে। স্নেহের একমাত্র ছোট বোন পান্নাকে সুপাত্রে বিয়ে দিতে হবে এই আমার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা।

সত্যিই, পান্নাকে সুখী করবার জন্যে যোগ্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজের হাত খরচা, ট্র্যাভলিং এক্সপেন্স, হোটেলে থাকার ব্যয় কমিয়ে কিছু কিছু করে সঞ্চয় করে রাখছিলাম। পান্নার প্রেমিককে কলকাতার রাজপথে মেট্রোর সামনে দেখে আমি খুশি হয়েছিলাম। গোপনে গোপনে ছেলেটির সন্ধান নিচ্ছিলামও।

ইতিমধ্যে পান্নার সঙ্গে যে সেই পাত্রটির বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তা আমি জানতাম না। কারণ যে-আমি এতদিন ছিলাম সে-আমির রূপান্তর ঘটতে লাগল দিনে দিনে।

আচ্ছা, এমন অমানুষ আমি হলাম কেমন করে? সে এমন কিছু এক বিচিত্র ইতিহাস নয়।

ইদানীং কিছু বাড়তি রোজগার করতে শিখেছিলাম। সৎপথে নয়—

প্রকাশ্যে আইন সম্মত উপায়ে নয়। কালোবাজারির অন্ধকার পথে। এ পথ আমাকে আমার মনিব পানওয়ানি সাহেবই চেনালেন। বাইরে থেকে দেখতে পানওয়ানি শেঠ বস্ত্র ব্যবসায়ী বোম্বে দাদার বাজারের দোকানদার। এ ব্যবসা তাঁর একটা মুখোশ মাত্র। আসল যা তার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে আমার দেরি হলনা।

সেই ব্যবসায় সূত্রে যাদের জানলাম, চিনলাম, সমাজের প্রকাশ্য স্থানে তাদের আসল মূর্তি দেখা যায় না।

ভ্রষ্টাচারের নগ্নরূপ দেখতে লাগলাম। ককটেল পার্টি, বারবনিতার কুসঙ্গ, নর্তকী, গায়িকা, বাইজীর আসর—ওরই মধ্যে নকল রত্নকে আসল বলে চালানো। একাজে দীক্ষা দিয়েছেন আমাকে স্বয়ং পান-ওয়ানি শেঠ। বাইরের লোক দেখানো পেশায় দু'দশখানি শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া আর ব্রা বিক্রি হল কি না হল তার জন্যে মাথাব্যথার দরকার নেই—হীরে, মুক্তো, চুনী, পান্না, জহরতের লেনদেন থাকলেই বহুত আচ্ছা। আর কিছুর জন্যে পরোয়া করেন না পানওয়ানি সাহেব।

তাই শাড়ির বাণ্ডিল পাশে রেখে একটি ব্রীফ কেস নিয়ে ঘোরো। যাও বারানসীর খানদানি মহলায়।

লক্ষ্ণৌ-এর বাইজী মহলে, গয়ার কু পল্লীতে, নাচ গানের আসরে, হৈ হুল্লোড়ের ফূর্তিখানায়—খদ্দের এখানেই আছে। সংগ্রহ করো এখান থেকেই তোমার মুনাফা। তার জন্যে যা খরচ-খরচা, পানওয়ানি সাহেব তা খুশি মনে বহন করেন।

সেই মুনাফা সংগ্রহে দিনকে দিন আগ্রহ আমার বাড়তে লাগল। রোজগার করতে লাগলাম বটে আমার পক্ষে যা আশাতীত; কিন্তু ডুবতেও লাগলাম পাপের সরোবরে ধাপে ধাপে।

সৎ প্রবৃত্তি হারালাম, বাপ মা বোনের প্রতি কর্তব্য হারালাম, নিজেকেও হারালাম অবশেষে এ আমার কী অধঃপতন ঘটল!

ঠকাতে ঠকাতে অবশেষে এমন জায়গায় এসে পৌঁছালাম যেখানে নিজেকেই ঠকালাম সবচেয়ে বেশি।

লক্ষ্ণৌ-এর মুক্তোবাই শুধু কাজরি নাচগানের পার্টির অধিনায়িকা নয়—সে নিজেও সুখ্যাত শিল্পী। নকল হীরে বেচতে পারিনি, কিন্তু নকল মুক্তো বেচেছি তাকে। সেখানে আমি জিতেছি, কিন্তু পরাজিত হয়েছি সেই পুরোন আভিজাত্যের প্রাসাদে যেখানে ভিখিরিই থেকে গেছি—অন্দরে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারিনি।

গয়ার অভিজাত হোটেলের বাইরের কামরার দরজায় দাঁড় করিয়ে মুক্তোবাই আমাকে ভিখিরির মতনই দেখেছে। আমার পূর্ব পরিচয়ের সামান্যমাত্র স্মরণের সম্মানও দেয়নি।

মোণি! কোন মোণি? পাচ্ছাস্তা নেহি।'

লালিমা নয়, মুক্তো অন্দর মহল থেকেই কথাগুলি ছুঁড়ে মারল।

এরপর আর পিতৃবন্ধু লালভানি কিংবা বোম্বাই এ পার্সিবাগানের প্রসঙ্গ তুলে লাভ কী? অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে এলাম গয়ার সেই হোটেল থেকে।

তারপর কামোন্মত্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম যে নটী পল্লীতে—আমার জীবনের সকল অহঙ্কার সেখানেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম।

মাতাল হয়ে কুৎসিৎ যৌন ব্যাধির সংক্রমণ নিয়ে হাজারিবাগ স্টেশন রোডের হোটেলের একটি কক্ষে যে চরম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারালাম আমি, সবচেয়ে দুঃখ আমার জীবনের পরিসমাপ্তি সেখানেই ঘটল না কেন!

সেখান থেকে হাজারবাগের এই হাসপাতালে এনে রাজসিক চিকিৎসায় যে আমাকে বাঁচিয়ে তুলল—সে কী শুধু তার মানবতা বোধ? অনেক অর্থ সে ব্যয় করেছে আমাকে মৃত্যুর দরজা থেকে

ফিরিয়ে আনতে।

আমি অচৈতন্য হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় পড়েছিলাম প্রায় সপ্তাহ কাল। ধীরে ধীরে আমার চৈতন্য ফিরে আসে হাসপাতালের সুযোগ্য ডাক্তারের চিকিৎসায়—সুদক্ষা নার্সের শুশ্রূষায়।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় আমার প্রতি এই সহৃদয়তা প্রকাশ করল যে—সে আমার কে?

কোথা থেকে সঠিক ঠিকানা সে যোগাড় করল তা আমার অপরিজ্ঞাত। বোম্বে দাদার বাজারে সিদ্ধি শেঠ আমার মনিব পানওয়ানির বদান্যতাও অনেক। প্রচুর অর্থ তিনি বাবার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন আমার মতন নগণ্য কর্মচারীকে নিরাময় করে তোলাবার জন্যে। কিন্তু আর কেউ না জানুক—আমি তো জানি এ বদান্যতা প্রকাশের অন্তরালে তাঁর স্বার্থবোধ নিহিত। আমার ছোট বোন পান্নাকে চাকরি দেওয়া, কন্যাবৎ সস্নেহ আচরণ তার প্রতি—তার অর্থও আমি জানি। তাঁর গোপন ব্যবসার কথা যাতে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায় আমাদের তরফ থেকে তাই বণিক দানবের এহেন দেবতাসুলভ আচরণ।

কিন্তু মুক্তোবাই? বাইজী মেয়ে আজো তার মুখের লাবণ্য, হৃদয়ের শুদ্ধ প্রেমকে জাগিয়ে রেখেছে কোন জীবন-তপস্যায় এবং সাধনায়?

কত টাকা যে আমার জন্যে খরচ করেছে তা কিসের প্রত্যাশায়? সেকথা ভাবতে গেলে সমস্ত চিন্তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ওলট-পালট হয়ে যায়।

আমার মনিব অর্থ সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু আমার পাপ কাজের পরিচয় পেয়ে 'ঝুটা হায়' বলে তিরস্কারও প্রকাশ করেছেন আমার বাবার কাছে।

চির আদরের ছোট বোন পান্না,—আমার দুষ্কর্মের জন্যে তারই লজ্জা যেন অপরিসীম।

বাবা ম্রিয়মান, বংশ গৌরবচ্যুত হওয়ার অপরিসীম বেদনায়।

ব্যতিক্রম শুধু মা। আমার স্নেহময়ী জননী—যিনি পাপী সন্তানকে স্নেহ ভরে বুকে চেপে ধরেছেন। জ্ঞানলাভের পর চোখ মেলে তাকিয়ে আমি যখন মা বলে কেঁদে উঠেছিলাম তখন তিনি আমার শায়িত মাথাটি সমাদরে কোলে টেনে নিয়েছিলেন।

আর,—আর সেই লালিমা,—আমার মৃত মনিবের আদরিণী দুহিতা আমার চোখের দিকে চোখ মেলে ধরেছিল ক্ষণকালের জন্যে। সেই পুলকের দৃষ্টিধারায় আমি দেখলাম—দু'টি চোখের কোণে দু'বিন্দু অশ্রু মুক্তোর মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

এখন আমি মধ্য কলকাতার সুরি লেনের দু'খানি ঘরের মধ্যে একখানি ঘরের শয়নশয্যায় আবদ্ধ। মা সর্বক্ষণ শুধু আমাকে সেবা দিয়ে করুণা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

বাবা একটা বড় ধারে কাছে আসেন না, শুধু ডাক্তার আমাকে দেখতে এঘরে এলে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় ছাড়া। ছোট বোন পান্না আমাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখে বোম্বে দাদার বাজারের কর্মস্থলে ফিরে গেছে। তার উপার্জনে এখন যে সংসার চলে।

আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটু সুস্থ হলে বাবা-মায়ের জিম্মায় আমাকে রেখে বাইজী মুক্তোবাই সিনেমার স্যুটিংএর কাজে চলে গেছে কলকাতায়। তারপর এখন সে কোথায় তার আর সন্ধান রাখিনে। তাকে কী আর কখনো দেখতে পাবো?

কিন্তু কী আশ্চর্য! গভীর রাতে কোলাহলমুখর শহর যখন নীরব নিথর তখন নিচের একতলার ঘরের শয্যায় কার ঘন কালো টানা টানা গভীর দু'টো চোখ আমার রাতজাগা আঁখির সঙ্গে মিলিত হয়।

খোলা জানলার বাতায়ন পথে দেখি আকাশের একফালি চাঁদের কী অপূর্ব লাবণ্য।

আর দু'টো উজ্জ্বল তারার চোখে দু'ফোঁটা অশ্রুর মুক্তো।

'মাগো ! ওমা, মা !'

নিজের বিছানা থেকে মা তাড়াতাড়ি জেগে উঠে আমার শায়িত মাথাটি নিজের কোলে টেনে নিয়ে সস্নেহে বলেন,—'এই তো, এই তো আমি ভয় কী বাবা !'

মা আমার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় আমার শরীরের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়।

আর ভাঙা চাঁদের অস্ফুট আলোয় দু'টি তারাচোখের অশ্রু-মুক্তোর পরশ আড়াল থেকে গহন রাতে কী লাবণ্য এবং স্নিগ্ধতার পরশ আমার সর্বাঙ্গে বুলোয় তা কী কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় ?

আমার বাকী জীবন কী তা আমি জানিনে। বর্তমানে এখনো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। পূর্বেকার সক্ষম কর্মজীবনও আর ফিরে পাবো কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবুও নিশীথের জাগরণে আকাশের তারাচোখে যে আলো তা শুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। মুক্তোবাই নয়—আসল মুক্তোর ঔজ্জ্বল্যকে স্পর্শ করি আমার হৃদয় আকাশের তারায় তারায়।

——